আইনের চোখে বিদ্যালয়ে শাস্তি অথবা Corporal Punishment

পড়ুয়াদের ওপর যে কোনো ধরণের দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন এখন নিষিদ্ধ। কিন্তু গত কয়েকমাসে ক্রমাণ্বয়ে ঘটে যাওয়া বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের ওপর বিভিন্ন ধরণের অত্যাচারের ঘটনা প্রমাণ করে কিছুই বদলায়নি, বরং তার মাত্রা এখন বহুমুখী। বিদ্যালয়ে শাস্তি যে বেআইনী তা একবার মনে করিয়ে দেবার জন্য বিভিন্ন সরকারি নির্দেশ ও বক্তব্যগুলির সংক্ষিপ্ত রূপ এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হল।

শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯ - শিক্ষা অধিকার আইনের ১৭ নং ধারা অনুসারে বিদ্যালয়ে মানসিক ও শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ। কোনো শিশুকে শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন করা যাবে না।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ - এই প্রসঙ্গে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি (1723-ES/S/10M-84/2010-dtd 24 November, 2010 **এবং** 09SE(S)-SL/5S-116/10 dtd. 6th January. 2011) - **এর মাধ্যমে** corporal punishment নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সুপ্রীম কোর্টের রায় - ১ ডিসেম্বর, ২০০০ সুপ্রীম কোর্টের রায়ে সমস্ত রাজ্যকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে কোনো বিদ্যালয়ে কোনো শিশুকে দৈহিক ও মানসিক শাস্তি দেওয়া যাবেনা, তারা স্বাধীনতা ও মর্যাদার সাথে ভয়মুক্ত পরিবেশে শিক্ষা পাবে - এই বিষয়টি রাজ্যকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

হাই কোর্টের রায় - বিদ্যালয়ে শাস্তির বিরুদ্ধে কলকাতা হাই কোর্ট ধারাবাহিকভাবে রায় প্রদান করেন।

প্রধান বিচারপতি শ্রী এ. কে. মাথুর ২০০৮ সালে বিদ্যালয়ে শাস্তিকে আইনবিরুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং এই মর্মে সরকারকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ দেন যে যদি কোনো শিক্ষক/শিক্ষিকা পড়ুয়াদের অত্যাচারের জন্য দোষী প্রমাণিত হন, তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠিনতম ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

সমপাঠ

জুলাই-আগস্ট ২০১২

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর মুখপত্র

আমাদের লক্ষ্য : শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এমন এক সমাজ গড়ে তোলা যেখানে শিক্ষা সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত

শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি ও পরিকল্পনা

জাতীয় শিক্ষানীতি, ১৯৮৬ অনুসারে শিক্ষাব্যবস্থা থেকে দৈহিক ও মানসিক শাস্তি সম্পূর্ণভাবে বাদ দিতে হবে। (ধারা ৫.৬)

শিশুদের জাতীয় সনদ, ২০০৩ দৈহিক ও মানসিক শাস্তির বিরুদ্ধে শিশুর সুরক্ষার অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় (অনুচ্ছেদ ৯এ)।

শিশুদের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা,২০০৬ এবং জাতীয় পরিকল্পনা, ২০০৭-২০১২-তে শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদনে বিদ্যালয়ে শাস্তিকে নিষিদ্ধ ও বন্ধের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ (NCPCR)-**এর নির্দেশাবলী** -(NCPCR)-এর নির্দেশাবলী অনুসারে রাজ্যগুলিকে বিদ্যালয়ে শাস্তি বন্ধের জন্য নির্দেশাবলী প্রকাশ করতে নির্দেশ দিয়েছে এবং ওকালতি প্রক্রিয়া গ্রহণে সচেষ্ট হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পড়ুয়াদের কাছ থেকে আসা অভিযোগ পর্যালোচনার জন্য একটি প্যানেল গঠন করেছে।

আসুন দেখে নেওয়া যাক দৈহিক শাস্তির কয়েকটি প্রচলিত প্রক্রিয়া -

- হাত অথবা লাঠি দিয়ে আঘাত করায়
- চুল টানা বা কান মুলে দেওয়া
- দীর্ঘক্ষণ ছাত্রছাত্রীকে দাঁড় করিয়ে রাখা
- ছাত্র ছাত্রীকে বেঞ্চের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখা
- বেত্রাঘাত বা চিমটি কাটা
- শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিল ডাউন করিয়ে রাখা
- স্কুলের ব্যাগ মাথায় নিয়ে রাখতে বলা

ইউনিসেফ-এর সমীক্ষা

মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়ে শাস্তির ঘটনার আধিক্য ভাবনার বিষয়। (শিশু নির্যাতন সমীক্ষা, ভারত ২০০৭, পৃষ্ঠা-৫৪)

দৈহিক ও মানসিক নিবারণ সংক্রান্ত নির্দেশিকা

পত্রাঙ্ক নং ২৬১১-জিএ তারিখ কলকাতা, ২২ জানুয়ারী, ২০০৯ হইতে : শিক্ষা, অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গ

সমীপে : ১) সকল সভাপতি, জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ ২) সকল জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক শিক্ষা) ৩) সকল জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক শিক্ষা)

সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে জাতীয় শিক্ষানীতি এবং শিশুর অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন হতে উদ্ভূত সিদ্ধান্ত অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে কোনো ধরনের দৈহিক নির্যাতন শৈক্ষিক পদ্ধতি ও নীতি হতে বর্জন করতে হবে। বস্তুত: বিদ্যালয়ে ছাত্র/ছাত্রীদের এপর শারীরিক নির্যাতন ভীষণভাবে দৈহিক এবং মানসিক আঘাত আনে যা বর্দ্ধমান শিশুর স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব বিকাশে প্রবল প্রতিবন্ধক। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে উক্ত বিষয়টির প্রতিষেধক হিসাবে নিম্নে প্রদত্ত নির্দেশাবলী

১) ধারাবাহিক প্রচার ও অবহিতকরনের মাধ্যমে প্রত্যেকটি ছাত্রকে দৈহিক নির্যাতনের বিরুদ্ধাচরণ করার বিষয়ে ক্ষমতায়িত করা প্রয়োজন এবং লক্ষ্য করা প্রয়োজন যাতে করে প্রত্যেকটি ছাত্র/ছাত্রী যদি কোনো শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়, তৎক্ষনাৎ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গোচরে আনতে সচেষ্ট হয়।

২) প্রত্যেকটি বিদ্যালয় শিশুর মানসিক বিকাশের পক্ষে যেন আদর্শ সহায়ক শক্তি হয়ে উঠতে পারে।

৩) প্রতিটি বিদ্যালয় একজন শিক্ষক উপদেষ্টাকে চিহ্নিত করবে যার কাছে ছাত্ররা উক্ত উপদেষ্টার সহানুভূতিশীল বিবেচনার জন্য তাদের অনেক গোপন তথ্য প্রকাশ করতে পারে। এই বিষয়ে প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি অভিযোগ জানানোর নির্দিষ্ট বাক্স রাখার প্রয়োজন যেখানে ছাত্র/ছাত্রীরা অকপটে তাদের সমস্যার বিষয়গুলো লিখিতভাবে জানাতে পারবে। পরবর্তী ধাপে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-উপদেষ্টা ছাত্র/ছাত্রীর নামধাম গোপন রেখে উদ্ভূত সমস্যার প্রতিবিধান করবেন।

৪) অভিভাবক-শিক্ষক সমন্বিত মাসিক সভার আয়োজন করতে হবে অথবা গ্রাম শিক্ষা সমিতি এবং ওয়ার্ডশিক্ষা সমিতি যৌথভাবে বসে অভিযোগ/অনুযোগের প্রতিবিধানে উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করবেন।

৫) অভিভাবক-শিক্ষক সমন্বিত সভাকে ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে যাতে করে ছাত্রছাত্রীর লিখিত অভিযোগ/অনুযোগের সঠিক সমাধান সুনিশ্চিত করা যায়।

৬) শিক্ষা অধিকর্তা, ছাত্রদের অভিযোগ/অনুযোগ সংক্রান্ত সমস্যা প্রতিবিধানের রূপরেখা নির্ধারণ করবে এবং বিষয়টির মোকাবিলার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের দিশা নির্ধারণ করবে।

উপরোক্ত বিষয়সমূহ অত্যন্ত নিবিড়ভাবে অনুধাবন করে প্রতিটি অনুমোদিত এবং অনুদান প্রাপ্ত/না অনুদান প্রাপ্ত বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সুনিশ্চিত করতে হবে যাতে প্রত্যেক ছাত্র/ছাত্রী অযথা শারীরিক ও মানসিক হয়রানির শিকার না হয়, যা কিনা শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের পরিপন্থী এবং শিশুর স্বাভাবিক শারীরিক বিকাশ ও মানসিক বিকাশের প্রবল প্রতিবন্ধক।

সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষা সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গকে স্মরণে রাখতে হবে যে 'শিক্ষার অধিকার' নিয়েই একটি শিশু বা একটি ছাত্র বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রবেশ করে। সুতরাং শিশুদের সাথে আচরণের ব্যাপারে শিক্ষক এবং শিক্ষাদরদী ব্যক্তিবর্গকে শিশুর 'শিক্ষার অধিকার'কে সুনিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সংযত এবং সংবেদনশীল হতে হবে।

স্বা: /-

দিব্যেন মুখার্জ্জী

শিক্ষা অধিকর্তা, শিক্ষা অধিকার, প: ব: সরকার

সম্পাদকীয়

বিদ্যালয়ে শাস্তি - একটি প্রশ্ন

মানবিক সম্পর্কগুলি পরিবর্তন হচ্ছে-কথাটা এখন প্রায়ই শোনা যায়। সমাজের বিভিন্ন ঘটনা (দুর্ঘটনা?) চোখে আঙুল দিয়ে দেখায় আজ সম্পর্কের সমীকরণ বদলে গেছে। তা খারাপ না ভালো সেই বিতর্ক অনেক গভীর। তবে আমরা আপাতদৃষ্টিতে বেশ কিছু সম্পর্কের অবনতিই দেখতে পাচ্ছি প্রতিনিয়ত। তার জলন্ত উদাহরণ বোধহয় শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেশ কিছু অবাঞ্ছিত ঘটনা আজ শিক্ষাব্যবস্থাকে কলুষিত করেছে বলা যায়। তার মধ্যে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য বিদ্যালয়ে শাস্তির ঘটনাগুলি। বিদ্যালয়ে শাস্তি বহু পুরানো ও প্রচলিত একটি প্রথা। যাতে দোষের কোনো কিছু দেখতেন না - শিক্ষক/শিক্ষিকা অথবা অভিভাবক কেউই, বোধহয় অনেকক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীরাও একে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিত (নিত কি?)। অনুশাসনের ঘেরাটোপে শিশুদের বেঁধে রাখতে এই পন্থা অবলম্বন করতেন প্রায় বেশিরভাগ শিক্ষক-শিক্ষিকা তথা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু বাধ সাধল শিক্ষা অধিকার আইন - আইনত বিদ্যালয়ে শাস্তি নিষিদ্ধ করে দিয়ে। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে তা ফলপ্রসূ হলেও আজ শিশুরা বিদ্যালয়ের নিরাপত্তার ঘেরাটোপেও অসুরক্ষিত। বেশিদিন নয় সাম্প্রতিক কালের বেশ কিছু ঘটনাই যদি আমরা পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে শাস্তির বহুমাত্রিকতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পন্থা উদ্ভাবন করার অভিনবত্ব আমাদের স্তম্ভিত করে দেবে। তার কিছু উদাহরণ আমরা এই সংখ্যায় দিলাম। অনেকেই হয়তো এগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। শুধু আর একবার ঘটনাগুলি মনে করিয়ে দেওয়া ও একটি প্রশ্ন রাখা সত্যিই কি বিদ্যালয়ে শাস্তি প্রয়োজনীয়? ছাত্র-ছাত্রীদের সুশাসনে ও সুশৃঙ্খলতার মধ্যে রাখতে গেলে বিকল্প ব্যবস্থাও আছে আমরা তারও বেশ কিছু উদাহরণ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এরসঙ্গেও মনে রাখা দরকার শুধু বিদ্যালয়ে নয়, বাড়ির সুরক্ষিত বলয়েও শিশুরা অভিভাবকের হাতে শাস্তি পায় ও পাচ্ছে, যেগুলিও বন্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের নিগৃহীত হওয়ার ঘটনাগুলিও কাম্য নয়। উভয় পক্ষের জন্য পারস্পরিক সহমর্মীতা ও সহযোগিতা শব্দ দুটি একান্ত প্রাসঙ্গিক। আমরা চাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফিরে আসুক সুস্থ স্বাভাবিক সম্পর্কের পরিবেশ ও তৈরি হোক শিশুবান্ধব ও আনন্দদায়ক পাঠদানের ব্যবস্থা। বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর মানসিক বা শারীরিক আঘাত ও বৈষম্যের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হোক এই আশা নিয়ে Corporal Punishment বিষয়ে কিছু আইনি ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে আমাদের এই বিশেষ সংখ্যা। আপনাদের সুপরামর্শ আমাদের একান্ত কাম্য। সমপথের পাঠক-পাঠিকাদের জন্য শারদীয়ার আগাম শুভেচ্ছা!

বিদ্যালয়ে শাস্তি : বিকল্প পথ

শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের বিকল্পের সন্ধানে

'শাসন তাঁরই সাজে সোহাগ করে যে' - এই গ্রাম বাংলার প্রচলিত কথা। কথার অর্থ সমাজে শাসন থাকবে সোহাগ থাকবে। মুশকিল হল শাসনের পরিভাষাটা বোঝা। আমাদের অনেকের ধারনা শাসন হল দৈহিক অথবা মানসিক শাস্তি। এখনও আমাদের সমাজে এক শ্রেণির শিক্ষক শিক্ষিকা ও এক শ্রেণির অভিভাবকের বিশ্বাস মারপিট না থাকলে লেখা পড়া হবে না। এই বোধটা আমাদের সকলের থাকা প্রয়োজন। অনেক শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন তাঁরা বর্তমানে শাসনের পক্ষে কারণ, তাদের কাছে শাসন মানে নিয়মের রূপরেখা। সেটা প্রয়োগ করবে ছাত্রছাত্রী নিজেরাই। যখন এই শাসন বড়রা বা শিক্ষক শিক্ষিকারা প্রয়োগ করতে যাবেন তখনই হবে মুশকিল। জোর করে চাপিয়ে দেওয়া আর না মানলেই শাস্তি বিধান। এখান থেকেই ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে শিক্ষক শিক্ষিকার ব্যবধান তৈরি হচ্ছে। শিক্ষক শিক্ষিকা যদি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীকে বলেন বিদ্যালয়ে কী কী নিয়ম হলে ভালো হয় এই বিষয়ে তোমরা বসে ঠিক করো। ক্লাসে/শ্রেণি কক্ষে কী কী নিয়ম হলে ভালো হয় তোমরা সবাই বসে লিখে ফেলো। তা হলে দাঁড়ায় ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের নিয়ম নিজেরাই তৈরি করল। আবার নিজেরা তৈরি করলেই যে সবাই মেনে চলবে সেটাও জোর দিয়ে বলা যায় না। হয়তো কেউ কেউ মানবে না। এর মধ্যে যখন কেউ প্রথম নিয়মভঙ্গ করলে তখন সবাই কে (ছাত্রছাত্রী) বলা তোমরাই এই সমস্যার সমাধান করো। ঠিক এই ভাবেই শ্রেণিকক্ষের নিয়ম শ্রেণিতে বসে ঠিক করা প্রয়োজন। শ্রেণিকক্ষকে ছাত্রছাত্রীদের ভালোবাসার জায়গা হিসাবে গড়ে তোলা শিক্ষকের অন্যতম ভূমিকা। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক বন্ধু সুলভ হওয়া বিশেষভাবে প্রয়োজন। শিক্ষক আলাদা কেউ নয় শ্রেণির/ক্লাসের একজন, এইরকম পরিবেশ হওয়া দরকার। এখানে কয়েকটি Activity-র উদাহরণ দিলে বিষয়টি ছাড়াই শ্রেণির মধ্যে কেউ কেউ বাইরে গেলে যাকে খুশি বলে যাওয়া। ছাত্রছাত্রী বা শিক্ষক শিক্ষিকা হোক না কেন। সকলেই এই নিয়ম অনুসরণ করবে। আবার শ্রেণির মধ্যে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকা কেউ ছুটি নিলে সবাইকে বলে নেওয়া। শ্রেণিতে কিছু খেলে সবাই ভাগ করে খাওয়া, মাঝে মাঝে যৌথ খাবারের ব্যবস্থা করা, এক জায়গায় বসে, একসঙ্গে গল্প, যুক্তি ও খেলা করা, এক সঙ্গে বেড়ানো। এই সময় অনুসরণের মধ্যে যদি কখনও শাসন করতে হয় তা হলে যৌথভাবে শাসন করা উচিত। যদি শ্রেণির কোন ছাত্রছাত্রী ভুল করল যেটা ক্লাস/শ্রেণির পরিবেশের পরিপন্থী তখন শিক্ষকের বলা দরকার তোমার এই ব্যবহারে আমি ভীষণ দু:খ পেয়েছে। তোমরা সবাই মিলে বসে ঠিক করো আমি ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। এই পথ অনুসরন করে আমি/আমরা ভালো ফল পেয়েছি।

'প্রতি মুখে ভাত প্রতি হাতে কাজ' - এই সত্যটা যদি মানা হয়। তাহলে শিশু অবস্থা থেকে কাজ করার অভ্যাস গড়ে উঠবে এবং ঐ ছাত্রছাত্রীর অন্য কিছু করার সুযোগ বা মানসিকতা থাকবে না। যদি একটি চার বছরের শিশুকে মালা গাঁথার কাজ কিম্বা চালডাল মিশানোকে আলাদা করতে বলা হয় সে এক মনে ঐ কাজটি করে যাবে। আমরা বড়োরা বলি অন্য জন বিরক্ত করতে পারে। আমি বলবো অন্যের হাতে কাজ থাকেনা বলে বিরক্ত করে। ''বাল্যের অভ্যাস চির কালের সাথী'' - ছোট অবস্থা থেকে যদি শিশুর অভ্যাস গড়ে তোলা হয় তা হলে এই অভ্যাস চিরদিন বহন করে যায়। কিন্তু আমাদের মধ্যে এখনও অনেক শিক্ষক শিক্ষিকা বলে থাকেন আমাদের কাছে মাত্র চার পাঁচ ঘণ্টা থাকে বেশিরভাগ সময় কাটায় বাড়িতে। কিভাবে অভ্যাস তৈরি করানো যাবে?

শ্রেণীকক্ষ বিদ্যালয় ও শিক্ষক শিক্ষিকা হবেন ছাত্রছাত্রীর কাছে একটি আদর্শ। যেখানে সময়ের অপেক্ষা রাখে না। এটা সময় দিয়ে মাপা যায় না। ''কাবুলি ওয়ালায়'' - রহমত ও মিনুর মধ্যে বন্ধুত্ব যদি সম্ভব হয়, তাহলে কেন একজন শিক্ষক শিক্ষিকার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। মিনু-রহমতের বয়সের তফাৎ তো বন্ধুত্বের বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। পরিশেষে বলি আমরা যদি বিদ্যালয়ে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন বন্ধ করে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বন্ধুত্বের ব্যবহার করি, তাহলে বোধ হয় ভাল হয়।

প্রতিবেদন - বিক্রমশিলা স্কুল, বিঘা বর্ধমান।

বিদ্যালয়ে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি না দিয়ে বিকল্প কিছু ভাবনা -

১) ছাত্র-ছাত্রীদের ছোট-ছোট দলে ভাগ করে দলগত কাজ দেওয়া, যথেষ্ট পরিমান উপকরণের ব্যবহার।

২) শ্রেণিকক্ষের ভিতরে দলগত কাজে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, শ্রেণিকক্ষের বাহিরে প্রকল্পের কাজে গোলমাল করে এমন ছাত্র-ছাত্রীদের দায়িত্ব / নেতৃত্ব দেওয়া।

৩) ছাত্র-ছাত্রীদের গোল করে বসিয়ে, মাঝখানে দুষ্টু ছাত্র-ছাত্রীকে বসানো অন্য ছাত্র-ছাত্রীরা তাকে প্রশ্ন করে জানার চেষ্টা করবে কোন ও দুষ্টুমি করেছে?

৪) যত দুষ্টুমি হোক না কেন প্রত্যেকের মধ্যে কিছু ভালো গুণ আছে। সেই কাজের স্বীকৃতি দেওয়া, সেই ভালো কাজ অন্যদের শেখানোর দায়িত্ব দেওয়া বা স্বীকৃতি দেওয়া।

৫) চোখ বন্ধ করে ধ্যান/আসন করতে দেওয়া।

৬) ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীদের বিচার সভা করা। (অবশ্যই শিক্ষক উপস্থিত থাকবেন)।

৭) শৃঙ্খলা কমিটি তৈরি। যেমন - ভালো ছাত্র-ছাত্রী কমিটিতে থাকবে তেমনি এক দুজন বড়, দুষ্টু ছাত্র-ছাত্রী থাকবে। ক) একটি হাই স্কুলে দশম শ্রেণির ছাত্ররা স্কুল পালাতো, শৃঙ্খলা কমিটি স্কুল পালানো বন্ধ করে দিয়েছে। খ) ঘন্টা পড়ার পরে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষ ছেড়ে গেলে ছাত্র-ছাত্রীরা বাইরে বেরিয়ে আসে, অন্য শিক্ষক না আসা পর্যন্ত চিৎকার করতে থাকে। শৃঙ্খলা কমিটি চিৎকার বন্ধ করতে পেরেছে।

৮) এসব কিছু করার পরেও যদি কোন ছাত্র বা ছাত্রী নিয়মিত দুষ্টুমি করে, তবে তাকে কাউন্সেলিং করানো দরকার। এবং অভিভাবক ডেকে আলোচনা করা দরকার।

৯) দুষ্টু ছাত্র-ছাত্রীকে সামনের দিকে বসানো /ভালো ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে মিশিয়ে বসানো।

১০) পারিবারিক অবস্থা / পারিপার্শ্বিক অবস্থা কেমন খোঁজ নেওয়া। তার ভিত্তিতে পড়ানোর ব্যবস্থা করা / কিছু সাহায্য করা / সেই মতো বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দেওয়া।

সমীর বিশ্বাস, স্বনির্ভর, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা

বিদ্যালয়ে শাস্তিরোধ করতে

১৯৮৯ সালে রাষ্ট্রসংঘের সম্মেলনে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই ঠিক করে শিশুদের কিছু বিশেষ অধিকার থাকবে যার সাহায্যে শিশু তার দৈহিক, মানসিক, সামাজিক দিকগুলির সঠিক বিকাশ ঘটিয়ে উপযুক্ত ভাবে গড়ে উঠতে পারে

স্কুল পড়ুয়াদের যে সব উপসর্গ দেখলে শিক্ষক শিক্ষিকাদের শির: পীড়ার কারণ হয় -

• পড়ার মনোযোগ দিতে না পারা। • ক্লাসের কাজ নিজে না করা এবং অন্যদের কাজ করার অসুবিধা সৃষ্টি করা। • পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হওয়া। • মিথ্যে কথা বলা। • দৈনন্দিন পড়া দিতে না পারা। • চুরি করা। • নিয়মিত অনুপস্থিত হওয়া। • অপরিস্কার অবস্থায় আসা। • বই, খাতা না নিয়ে আসা। • কথা না শোনা। • ক্লাসে অনেকক্ষন বসে থাকতে না পারা।

শাস্তি - উদ্বেগ - পরীক্ষার ভীতি - ব্যর্থতা - খারাপ রেজাল্ট - হতাশা - অল্পতা - ভয় - চুপচাপ হয়ে যাওয়া - ধমক - সন্দেহ - চাপিয়ে দেওয়া - ব্যার্থতা - মারধর - জেদ - অবাধ্যতা -

ব্যার্থতা - মিথ্যে কথা - অমনযোগ - নেতিবাচক - সমালোচনা - দোষাভাগ - হতাশা - আত্ম বিশ্বাসের ঘাটতি।

শুধু বই থেকে না পড়িয়ে :

• আমাদের হাতে কলমে কিছু করার মাধ্যমে যদি পড়ানো হয়। • ক্লাসরুমের বাইরে নিয়ে গিয়ে আশে পাশের পরিবেশের সঙ্গে পরিচিতি গড়ে তোলার মাধ্যমে যদি পড়ানো হয়। • ছোটখাটো সমীক্ষা বা প্রকল্প তৈরির মাধ্যমে যদি পড়ানো হয়। • গল্প, গান ও নাটকের মাধ্যমে যদি পড়ানো হয়। • অ্যাবাকাস ও ব্লকের মাধ্যমে যদি অঙ্ক শেখানো হয়। • গ্রুপে কাজ করানো। • একটু স্বাধীনতা দেওয়া ও তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া। • বাগান করা, স্কুল পরিস্কার করা বা ক্লাস ঘর সাজানোর মতো সৃজনমূলক কিছু কাজ দল বেঁধে করা। • নিয়মিতভাবে কিছু মজাদার শারীরিক শ্রমের কাজে বা খেলাধুলোয় আগ্রহী করে তোলা। • ভুল করা কাজটিকে দ্বিতীয়বার নির্ভুলভাবে করতে বলে সংশোধনের সুযোগ দেওয়া। • ক্লাসরুমের বাইরে বসে ক্লাস করানো।

কয়েকটি কমিটি থাকা জরুরি

- শিশু সংসদ - মূল্যায়ন কমিটি - ড্রপ বক্স কমিটি

তাদের নিয়ে নিয়মিত বসা ও বিষয় নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া।

শাস্তির বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা

- অভিযোগ বাক্সের অভিযোগ গুলি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বলা।
- যে মুহূর্তে দোষ করল তাকে ৫ মিনিট আলাদা করে বসানো। ফিরে এসে যে অনুভব করল সেটা লিখে ছবির দ্বারা প্রকাশ করা।
- যে প্রচুর গন্ডগোল বা দুষ্টুমি করে তাকে যে কোন কাজের দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া।
- মূল্যায়ন কমিটিতে ঢুকিয়ে দেওয়া।

এক্ষেত্রে বিকল্প যে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে -

- কোনো দোষ করলে যে কোন কাজ করে দেখাতে হবে যেমন হনুমান ডন, ব্যাঙ লাফানো, পাখীর ডাক, জানোয়ারের ডাক, গান, নাচ, আবৃত্তি।
- যারা নিয়মিত গন্ডগোল করে তাদের কোন বিষয় সামাজিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়া। হাতের লেখা, শ্রেণি পরিচালনা।
- কোন শিশুর দ্বারা অন্য শিশুর ক্ষতি (শারীরিক) হলে তার দ্বারা শুশ্রুষার ব্যবস্থা প্রদান করা।
- অন্য শ্রেণিতে কিছুক্ষনের জন্য পাঠানো।
- ইংরেজী অর্ডারের মাধ্যমে ওঠা-বসা করানো।
- পর্বভিত্তিক কে কত দুষ্টুমি করছে অপরের দ্বারা নিজের ত্রুটি তালিকা তৈরি করা।
- নিজের দ্বারা ছুটির শেষে প্রাত্যহিক তথ্য প্রদান করা এবং তথ্যের উপর সপ্তাহে একদিন পর্যালোচনা করা।
- বাৎসরিক পুরস্কারের ব্যবস্থা প্রদান।
- গন্ডগোল চলাকালীন নিজে চুপ করে বসে যাওয়া
- চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ মেডিটেশন করা।
- যে বেশী গন্ডগোল করে তাদের দিকে বেশীর ভাগ সময় আই কন্ট্যাক্ট রেখে পাঠদান করা।
- দুষ্টামি কিংবা পাঠদান করার সময় আজেবাজে কথা বললে সহায়ক-সহায়িকা ক্লাস বয়কট করবেন না।
- বিভিন্ন জিন শ্রেণিকক্ষে বিভিন্নরকম উদে নিতে হবে যার শিশু একই ধরনের মনে না করে।
- অভিনয় করা।
- দুষ্টামি করলে প্রশ্ন করা হবে যেগুলি সে উত্তর দিতে পারবেনা।
- ছাত্র-সংগঠনে আলোচনা করা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া।

দিপালী নন্দী, পূর্ব মেদিনীপুর

বিদ্যালয়ে শাস্তির সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা

বিদ্যালয়ে শাস্তি আইনত নিষিদ্ধ হলেও তা যে বন্ধ হয়নি, তা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু শিক্ষকদের শাস্তি দেবার নতুন উদ্ভাবনী পন্থাগুলি আমাদের স্তম্ভিত করে। শুধুমাত্র জুলাই মাসে সংবাদপত্রে প্রকাশিত কিছু ঘটনাবলী এখানে তুলে ধরা হল -

প্রস্রাব চাটানো

শান্তিনিকেতনে পাঠভবনের করবী ছাত্রী নিবাসের ওয়ার্ডেন পঞ্চম শ্রেণীর এক আসাবসিক ছাত্রীকে বিছানা ভিজিয়ে ফেলার জন্য তারই প্রস্রাব চাটানোর অপরাধে দোষী প্রমাণিত হন। পরবর্তীকালে মানসিক আঘাতপ্রাপ্ত ছাত্রীটি বিদ্যালয় পরিবর্তন করে।

মারধর করা

পূর্ব মেদিনীপুরের শালবনীতে এক সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রকে অঙ্ক করতে না পারার অপরাধে শিক্ষকের মারের চোটে হসপিটালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি করা হয়।

কলকাতার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কেজি ক্লাসের এক ছাত্র বাড়ি যাবার জন্য কাঁদছিল। বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর এক কর্মীর হাতে বেধরক মার খায় সে।

নদিয়ার একটি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কাছে একজন শিক্ষকের সঠিকভাবে ক্লাস না করার অভিযোগ জানায় অষ্টম শ্রেণীর কিছু পড়ুয়া। তার ফলে তাদের মারধর করেন অভিযুক্ত শিক্ষক।

খরদার একটি বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির এক ছাত্রীকে ক্লাসে কথা বলার জন্য ডাস্টার ছুড়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেন শিক্ষিকা।

ব্যারাকপুরের একটি বিদ্যালয়ে সরকারী বই-এর পরিবর্তে অন্য বই পড়ানোর প্রতিবাদের অপরাধে সপ্তম শ্রেণী দুই ছাত্রকে মারধরের অভিযোগ ওঠে বিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে।

পোষাক খোলানো

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার একটি স্কুলে সহপাঠীর টাকা চুরির অপবাদ দিয়ে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রীকে পোশাক খুলিয়ে দেহ তল্লাশী করেন শিক্ষিকারা।

পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়ার একটি বিদ্যালয়ে ক্লাসে জল ফেলার অপরাধে প্রধান শিক্ষিকা অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রীকে মারধরের পর পোশাক খুলে জল মোছার নির্দেশ দেন।

আগুনের ছ্যাঁকা দেওয়া

কৃষ্ণনগরের একটি বিদ্যালয়ে দুষ্টুমি করার অপরাধে দ্বিতীয় শ্রেণীর এক ছাত্রকে বিড়ির ছ্যাঁকা দেন এক শিক্ষক।

যৌন হেনস্থা

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গ্রেপ্তার হন ঐ বিদ্যালয়েরই এক চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রীর নিয়মিত যৌন হেনস্থার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর।

তবে বিদ্যালয়ে শাস্তির চরম উদাহরণ বোধহয় দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঝড়খালির একটি আবাসিক বিদ্যালয়ে নিম্নমানের মিড-ডে-মিলের প্রতিবাদ করায় অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনাটি।

জেলা কমিটির সভা

উত্তর দিনাজপুর

গত ৪ আগস্ট, ২০১২ উত্তর দিনাজপুর জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের জেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় জেলা কার্য্যালয়ে। সভাপতির নির্দেশে রাজ্য সঞ্চালক নতুন সংবিধান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। এরপর তিনি ২০১২-১৩ আর্থিক বৎসরের পরিকল্পনা ও বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করে শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে নিবিড় প্রচারের জন্য গ্রাম নির্বাচনের পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা করেন। প্রচার কাজে যেসব স্বেচ্ছাসেবক, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যা যুক্ত হবে তাঁদের নিয়ে কর্মশালার প্রস্তাব দেন। সভায় উপস্থিত সকলের সহমতে আগামী ২৯ আগষ্ট, ২০১২ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের নিয়ে প্রথম কর্মশালা আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এদিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন শিক্ষিকা ভারতী সরকার।

উত্তর ২৪ পরগনা

গত ১১ আগষ্ট, ২০১২ উত্তর ২৪ পরগনা জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের জেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় নেটওয়ার্কের সদস্য সংগঠন দ্য বিভি নিউজ-এর কার্য্যালয়ে। সভার শুরুতে নতুন ব্লক বাগদা এবং বনগাঁও থেকে আসা প্রতিনিধিদের সাথে সকলের পরিচয় হয়। জেলা আহ্বায়ক সমীর বিশ্বাস ৬-৮ আগষ্ট, ২০১২ অনুষ্ঠিত রাজ্য সাধারণ পরিষদের সভার বিবরণ পেশ করেন। শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে নিবিড় প্রচার কর্মসূচির জন্য প্রতিটি ব্লকের প্রতিনিধিরা গ্রাম চিহ্নিত করেন। প্রাথমিকভাবে গ্রাম নির্বাচন হলেও আরও এক সপ্তাহের জন্য সময় দেওয়া হয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। এরপর প্রচার কর্মসূচিতে যে সকল স্বেচ্ছাসেবী, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যা, সিবিও, এনজিও প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করবেন তাঁদের নিয়ে ৪টি কর্মশালার জন্য স্থান ও তারিখ ঠিক করা হয়। রাজ্য পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীতে জেলার মহিলা প্রতিনিধি হিসেবে মনিকা সরকারের নাম প্রস্তাব ও গৃহীত হয়। বিভিন্ন শিশুঅধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার অনুসন্ধানের জন্য যে কমিটি গঠনের কথা সিদ্ধান্ত হয়েছে তার জন্য জেলা প্রতিনিধি হিসেবে শৈলেন্দ্রনাথ কাবাসি ও গৌরগোপাল সরদারের নাম প্রস্তাব ও গৃহীত হয়। পরবর্তী জেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৩ অক্টোবর, ২০১২ হিঙ্গলগঞ্জে। সদস্য চাঁদা আগামী সভায় সকল সদস্য দেবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এদিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন গৌরগোপাল সরদার।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা

গত ১৬ই আগস্ট মথুরাপুরের রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির সভা আয়োজিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী শচিন্দ্রনাথ হালদার। সভার আলোচ্য সূচী ছিল সংশোধিত সংবিধান নিয়ে আলোচনা, ২০১২-১৩ সময়কালের পরিকল্পনা, সাংগঠনিক - সমপথ, সদস্য সংগ্রহ, রাজ্য মহিলা ও শিশু প্রতিনিধি, অনুসন্ধান কমিটির সদস্যের নাম নির্বাচন। সভাপতির স্বাগত ভাষণের পর রাজ্য সঞ্চালক আলোচ্যসূচীগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বিস্তৃতভাবে গ্রামস্তরে প্রচার অভিযানের পরিকল্পনাটি আলোচনা করেন। এছাড়াও ৬-৮ অগাষ্ট, ২০১২ অনুষ্ঠিত রাজ্য সাধারণ পরিষদের সভার সিদ্ধান্তগুলি পেশ করেন। সভায় জেলা কমিটি ৬১টি গ্রাম চিহ্নিত করেন। কোন গ্রামে কারা দায়িত্বে ও পরিকল্পনা ও বাজেট অনুসারে ৬০টি গ্রামকে চূড়ান্ত করার পর মূল পরিকল্পনাটি আগামী ২৫শে অগাস্ট রাজ্য অফিসে জমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। স্বেচ্ছাসেবকদের কর্মশালাটির জন্য আগামী ৩০ - ৩১ অগস্ট সুন্দরবন সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট সেন্টারে আয়োজিত হবে। ৩০শে অগাস্ট সিবিও ও এনজিওদের জন্য এবং ৩১শে অগাস্ট স্বনির্ভর দলের কর্মশালা আয়োজিত হবে। পঞ্চায়েত প্রধানকে চিঠি দেওয়া হবে কর্মশালার আগে। এরপর শ্রীমতি বিথিকা হালদার রাজ্য প্রতিনিধি হিসেবে এবং শ্রীমতি পুতুল সরদার রাজ্য অনুসন্ধান কমিটির সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন। শিশু প্রতিনিধির নাম পরে ঠিক করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সমপথ ও সদস্য সংগ্রহের বিষয়টি পরে আলোচনা হবে। সংশোধিত সংবিধান নিয়ে পরবর্তী সভায় বিস্তৃতভাবে পাঠ করা হবে ও আলোচনা করা হবে। সভার শেষে সভাপতি সঠিক সময়ে কাজগুলি সুসম্পন্ন করা ও রাজ্যে পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানান ও সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

বর্ধমান

গত ২৭ অগস্ট, ২০১২ বর্ধমান জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের জেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হল কুসুমগ্রামের শিশুমন মডেল বিদ্যাপীঠে। এদিনের সভায় প্রথমে ওয়েবেনের সংশোধিত সংবিধান নিয়ে আলোচনা করেন রাজ্য সঞ্চালক চিররঞ্জন পাল। তিনি সভাপতির নির্দেশে রাজ্য সাধারণ পরিষদের সভার বিবরণও পেশ করেন এবং শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে নিবিড় প্রচার কর্মসূচি বিষয়ক জেলা পরিকল্পনা দিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এদিনের সভায় ব্লক প্রতিনিধিদের মতামতের ভিত্তিতে প্রচার কর্মসূচির জন্য গ্রাম চিহ্নিত করা হয় এবং গ্রাম ভিত্তিক প্রচারের দায়িত্ব কে গ্রহণ করবেন সে বিষয়েও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রচারের আগে প্রচার কাজে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তিনটি কর্মশালার আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১২ কাটোয়া, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১২ কুসুমগ্রাম এবং ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১২ পূর্বস্থলীতে এই কর্মশালার আয়োজন করা হবে। এদিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রশান্ত কারফর্মা।

উত্তর ২৪ পরগনা

গত ২৩শে জুলাই স্বনির্ভরের কার্য্যালয়ে উত্তর ২৪ পরগনা নবনির্বাচিত কমিটির প্রথম সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন গৌরগোপাল সরকার। যেহেতু ২০১২-১৩ সালের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা শিক্ষা নেটওয়ার্ক কমিটির প্রথম মিটিং তাই পরিচয় পর্বের মাধ্যমে সভা শুরু হয়। সমীর বিশ্বাস ও দিলীপ পাল উভয়ে উপস্থিত সকল সদস্যদের সামনে গত মাসের রাজ্য কমিটির মিটিংয়ের রিপোর্ট পেশ করেন। বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী ওয়েবেন তার সংবিধান সংশোধন করতে চলেছে। বিগত দিনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ওয়েবেনের রাজ্য ও জেলা কমিটিতে কিছু পরিবর্তন আনছে। এই আলোচনাতে রাজ্য সঞ্চালক বেশ কিছু সহযোগীতা করেন। এই আলোচনার ভিত্তিতে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা শিক্ষা নেটওয়ার্ক কমিটিতে কিছু পরিবতন ঘটে। সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত অনুসারে জেলা থেকে ওয়েবেন রাজ্য কমিটিতে প্রতিনিধি হিসাবে হাসানুজ্জামানের পরিবর্তে দিলীপ পালের নাম গৃহীত হয়। মাননীয় হাসানুজ্জামান মহাশয় জেলা আহ্বায়ক সমীর বিশ্বাস মহাশয়কে সহযোগী আহ্বায়ক (কো-কনভেনর) হিসাবে সদাসর্বদা সহযোগীতা করবেন। সিদ্ধান্ত হয় ৩১শে জুলাই উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গোপালনগর গিরিবালা বালিকা বিদ্যালয়ে নির্যাতিতা ছাত্রীর সাথে কথা বলার জন্য জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ৭ জনের একটি দল যাবে। এরকম বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের উপর নিয়মিত অত্যাচার ঘটেই চলেছে। তারই প্রতিবাদ জানানোর জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যে গণ স্বাক্ষর সংগ্রহ করে পাঠানোর কথা ছিল, তা সকল সদস্যগন ১১ই আগষ্ট, ২০১২ তারিখের মধ্যে ওয়েবেনের জেলা অফিসে জমা দেবেন।

সভায় সিদ্ধান্ত হয়, ওয়েবেন থেকে যে সকল খবরের কাগজের কাটিং জেলা অফিসে আসছে, সেগুলো সমীর বিশ্বাস জেরক্স করে সকল সদস্যগনকে দেবেন। গ্রামে ও স্কুলে যেসকল নোটিশবোর্ড আছে সেখানে এই খবরগুলো আটকানো হবে। এছাড়াও নিজেদের সংগ্রহ করা খবর, সমপথ পত্রিকা সবই নোটিশ বোর্ডে টাঙানো হবে। এছাড়াও সমপথের জন্য প্রত্যেক সদস্য একাজের সুবিধা, অসুবিধা, কেস স্টাডি ইত্যাদি নিয়মিত জেলা অফিসে জমা দেবেন। এছাড়াও জেলার আর্থিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় ও বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সাংবাদিক শৈলেন্দ্রনাথ কাবাসী মহাশয় জানান, গত ১৯ শে জুন, ২০১২ উত্তর ২৪ পরগনা জেলা শিক্ষা নেটওয়ার্ক যে সাংবাদিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছিল তার ভিত্তিতে কয়েকটি ছোটো পত্রিকায় তার রিপোর্ট বেরিয়েছিল। যেমন, পাক্ষিক জেলা হিতৈষী, কল্লোলিনী ইছামতী, পাক্ষিক সারাংশ, যমুনামতী, উত্তর শ্রীভূমি, এখনও আরও কয়েকটি ছোটো পত্রিকায় প্রকাশিত হবে। সভায় সিদ্ধান্ত হয় ব্যারাকপুর-১, ব্যারাকপুর-২, হাবরা, বনগাঁ, আমডাঙা, সন্দেশখালি-১, হাড়োয়া ইত্যাদি ব্লকগুলিতে কাজ শুরু করার জন্য সমস্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদেরকে পরবর্তী মিটিংয়ে সঙ্গে আনার ব্যবস্থা করবেন। এরজন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নামগুলিও স্থির করা হয়। সবশেষে সভাপতি গৌরগোপাল মহাশয় সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে উক্ত সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

হুগলী জেলা

গত ২৫শে অগাস্ট হুগলি জেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় মাখলা মুক্তধারার কার্য্যালয়ে। ঐদিন সভার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল গ্রামস্তরে প্রচার অভিযানের জন্য গ্রাম চিহ্নিতকরণ ও দায়িত্ব বন্টন, রাজ্য কমিটিতে প্রস্তাবের জন্য মহিলা সদস্যের নাম মনোনীত করা, বিবিধ। সভার শুরুতেই স্বাগত ভাষণ দেন জেলা আহ্বায়ক শ্রী তপন কুমার দাস। তিনি তাঁর বক্তব্যে রাজ্য সাধারণ পরিষদে গৃহিত সিদ্ধান্তগুলি আলোচনা করেন। এরপর গ্রামস্তরে প্রচার কর্মসূচী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন রাজ্য সঞ্চালক। এরপর সর্বসম্মতিক্রমে পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঁচটি গ্রাম ও ঐ গ্রামের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি/সংগঠনের নাম স্থির করা হয়। এই স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য ধারণাবৃদ্ধির কর্মশালা আয়োজিত হবে আগামী ১০ই সেপ্টেম্বর মাখলা মুক্তধারার কার্য্যালয়ে। কর্মশালায় গ্রামপ্রতি তিনজন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করবেন। পরিকল্পনা অনুসারে পঞ্চায়েতের চিঠি পাঠানো হবে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। রাজ্য কমিটিতে প্রস্তাবের জন্য মহিলা সদস্য হিসেবে রুকসানা মন্ডলের নাম মনোনীত করা হয়। শিশু প্রতিনিধির নাম পরে ঠিক করা হবে। সমপথের হিসাব দেওয়া হবে রাজ্যে হিসাব পাঠানোর সময়। জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জেলাতে হিসাব রক্ষক হিসেবে প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জী নাম মনোনীত করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী মলয় সেন।

পূর্ব মেদিনীপুর

গত ১৯শে অগস্ট, ১০১২ পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সাধারণ পরিষদের সভা হয় কাঁথির ক্ষেত্রমোহন বিদ্যাপীঠে। সভার সভাপতিত্ব করেন শ্রী ঠাকুরদাস মন্ডল। সভার শুরুতেই শ্রী স্বপন পন্ডা ও শ্রীমতি দীপালি নন্দীকে রাজ্য কমিটির নেতৃত্ব পদে নির্বাচিত হওয়ার জন্য জেলা কমিটির পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। শ্রী পন্ডা তার অভিজ্ঞতার উদাহরণের মাধ্যমে ওয়েবেনের কাজকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সেবিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। শ্রীমতি নন্দী সবার সঙ্গে মিলিত উদ্যোগে কাজ করার কথা এবং জেলার সুনাম বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট হওয়ার কথা বলেন। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল - গ্রামস্তরে প্রচারের জন্য গ্রাম নির্বাচন ও দায়িত্ব বন্টন, সাংগঠনিক বিষয় ও পরিকল্পনা। এই সভায় ২৯ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভায় জেলার পক্ষ থেকে ৭০টি গ্রাম প্রচারের জন্য চিহ্নিত করা হয় এবং কোন গ্রামে কোন সদস্য, স্বেচ্ছাসেবক, স্বনির্ভর দল, এনজিও বা সিবিও দায়িত্ব নেবেন সেই বিষয়গুলি ঠিক করা হয়। এরসঙ্গে ব্লক এ জেলা কমিটির সভাগুলি যাতে নির্দিষ্টভাবে আয়োজন করা হয় সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় - ব্লক কমিটির সভাগুলি প্রত্যেক মাসের চতুর্থ শনিবার এবং জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সভা প্রত্যেক মাসের তৃতীয় শনিবার আয়োজিত হবে। এছাড়াও প্রচার কর্মসূচীর জন্য পঞ্চায়েতের কাছে চিঠির প্রতিলিপি প্রত্যেক গ্রামের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাছে বন্টন করা হয়।

শিক্ষা অধিকার আইন ও প্রচার কর্মসূচি বিষয়ক কর্মশালা

উত্তর দিনাজপুর

ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে বিনাব্যয়ে শিশুর বাধ্যতামূলক শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯ কে গ্রামস্তরে প্রচারের যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তার প্রাক প্রস্তুতি হিসেবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করেছিল উত্তর দিনাজপুর জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্ক। গত ২৯ অগস্ট, ২০১২ নেটওয়ার্কের জেলা কার্য্যালয়ে রায়গঞ্জ ও করনদিঘি ব্লকের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের নিয়ে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় যে সকল গ্রামগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে সেই সব গ্রামের বিদ্যালয়ের পরিস্থিতি, শিক্ষা অধিকার আইন, প্রচার কর্মসূচির উদ্দেশ্য, গ্রামস্তরে প্রচারের জন্য কি কি কাজ করতে হবে, প্রচারের পর জেলাস্তরের কাজ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য ছাড়াও ব্লক আহ্বায়ক, জেলা কমিটির সদস্য এবং রাজ্য সঞ্চালক এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১২ হেমতাবাদ এবং কালিয়াগঞ্জ ব্লকের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের নিয়ে আরও একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান উত্তর দিনাজপুরের জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের জেলা আহ্বায়ক কবিতা দাস। তিনি আরও জানান এবছর জেলায় মোট ৪০টি গ্রামে শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে প্রচারের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা নেটওয়ার্ক গত ৩০-৩১শে অগষ্ট গ্রামস্তরে প্রচার কর্মসূচীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য, এনজিও, সিবিও, স্বেচ্ছাসেবকদের দিয়ে ধারণাবৃদ্ধির কর্মশালার আয়োজন করা হয় সুন্দরবন সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের কার্য্যালয়ে। প্রথম দিনের সভাতে উপস্থিত ছিলেন ২৮টি স্বনির্ভরদলের সদস্য। জেলা আহ্বায়ক শ্রী রবিশঙ্কর রায় স্বাগত ভাষনে এই কর্মশালার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। পরিচয় পর্বের পরে এলাকার শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধষরন অংশগ্রহণকারীরা। সেই সমস্যার সূত্র ধরে রাজ্য সঞ্চালক শিক্ষা অধিকার আইন ও রাজ্য নিয়মাবলীগুলি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। এর সাথে শিশু অধিকার ও এই সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন, শিশু কল্যাণ সমিতির ভূমিকা নিয়ে তিনি সংক্ষেপে আলোচনা করেন। এরপর গ্রামস্তরে প্রচার অভিযানের উদ্দেশ্য, এই প্রচার অভিযানে কিভাবে কাজ করতে হবে এবং প্রচার থেকে কি কি আশা করা হচ্ছে সেবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন রাজ্য সঞ্চালক। এইদিনের কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী শচীন্দ্রনাথ হালদার।

দ্বিতীয়দিনের কর্মশালাটি আয়োজিত হয় মথুরাপুরের শ্রী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে। এইদিনের কর্মশালায় সিবিও, এনজিও, স্বেচ্ছাসেবক, জেলা কমিটির সদস্যসহ মোট ৩০ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। এই দিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী গোপাল দেবনাথ। জেলা আহ্বায়ক শ্রী রবিশঙ্কর রায় স্বাগত ভাষনে এই কর্মশালার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। রাজ্য সঞ্চালক শিক্ষা অধিকার আইন ও রাজ্য নিয়মাবলীগুলি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। এর সাথে শিশু অধিকার ও এই সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন, শিশু কল্যাণ সমিতির ভূমিকা নিয়ে তিনি সংক্ষেপে আলোচনা করেন। এরসঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। এই সভায় উপস্থিত অনেকেই এনসিপিসিআর-এর জনশুনানীতে অভিযোগ সংগ্রহে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং গত এপ্রিল মাসের গ্রামস্তরের প্রচারে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেই অভিযোগ এবং বিদ্যালয় ছুট তালিকায় শিশুদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তাঁরা জানান। এরপর গ্রামস্তরে প্রচার অভিযানের উদ্দেশ্য, এই প্রচার অভিযানে কিভাবে কাজ করতে হবে এবং প্রচার থেকে কি কি আশা করা হচ্ছে সেবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন রাজ্য সঞ্চালক। সভার শেষে জেলা কমিটির সদস্যরা রাজ্য সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ এবং প্রচার কর্মসূচীর সময়কাল নির্ধারন করেন।

অন্যান্য সংবাদ

জেলা ও রাজ্য স্তরে ওয়েবেনের কমিটি পুনর্গঠিত হল

ওয়েবেনের সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে। সেই সংশোধিত সংবিধান অনুসারে রাজ্য ও জেলাস্তরের কমিটিগুলি পুনর্গঠন করা হয়েছে। সংশোধিত সংবিধান অনুসারে রাজ্য ও জেলাস্তরে একক নেতৃত্ব পুনর্বহাল করা হয়েছে। রাজ্যস্তরে একটি সাধারণ পরিষদ এবং সম্পাদকমন্ডলী গঠন করা হয়েছে। রাজ্যস্তরে সর্বসম্মতিকঅমে আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছেন শ্রীমতি দীপালি নন্দী। জেলাস্তরে সাধারণ পরিষদ গঠনের সুযোগ রয়েছে। জেলা তার কার্যক্ষেত্র অনুসারে তা গঠন করবে। জেলায় সর্বাধিক ১১জন এবং সর্বনিম্ন ৯ জনের সম্পাদকমন্ডলী গঠন করা হয়েছে।

ওয়েবেনের নতুন রাজ্য সাধারণ পরিষদের সভা

ওয়েবেনের রাজ্য সাধারণ পরিষদের প্রথম সভা আয়োজিত হল আই.আই.টি.ডি. জোকাতে গত ৬ - ৮ অগাস্ট, ২০১২। প্রথম দুইদিন এই সভায় রাজ্যস্তরীয় সম্পাদকমন্ডলী গঠন ও রাজ্য আহ্বায়ক নির্বাচন করা হয়। এরপর আগামি ২০১২-২০১৩ সময়কালের পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এই বছরের পরিকল্পনা অনুসারে ওয়েবেন রাজ্যের ৩০৫টি গ্রামে নিবিড় প্রচার কর্মসূচী আয়োচিত করবে। সেই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য, আশানুরূপ ফলাফল, কিভাবে প্রচার করা হবে এবং প্রচার কাজের পরবর্তী কার্যকলাপ ও অন্যান্য পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এই পর্বটি পরিচালনা করেন রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর অন্যতম সদস্য শ্রী স্বপন পন্ডা। এরপর সাংগঠনিক বেশ কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। তৃতীয় দিন শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯-এর বিভিন্ন ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য নিয়মাবলী নিয়ে আলোচনা করেন শ্রী স্বপন পন্ডা ও শ্রী চিররঞ্জন পাল। শ্রীমতি দীপালি নন্দী এই বিষয়ে কিভাবে কি কি কাজ করা যাবে সেই বিষয়ে আলোচনা করেন। উপস্থিত সকলেই এই বিষয়ে মতামত প্রদান করেন। তিনদিনের এই সভাটি সভাপতিত্ব করেন শ্রী কিংশুক ভট্টাচার্য্য।

ওয়েবেনের সংবিধান সংশোধন করা হল

ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক (ওয়েবেন) তার কর্মপদ্ধতি ও সাংগঠনিক পরিকাঠামোকে সুদৃঢ় করার জন্য সংগঠনের সংবিধান রচনা করেছে এবং সেই মোতাবেক চলার চেষ্টা করেছে। এই সংবিধান কাজের ধারাকে আরোও গতিময় করতে কয়েকবার সংশোধিত হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে ওয়েবেনের জেলা ও রাজ্য যৌথ নেতৃত্বের ব্যবস্থাপনা ছিল দু স্তরেই বেশ কয়েকটি কমিটি ছিল, যারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে ওয়েবেনের কর্মকান্ডকে এগিয়ে নিয়ে যেতেন। বিগত কয়েক বছরে কাজের প্রক্রিয়া, বিষয়, কৌশলের পর্যালোচনা করে ওয়েবেনের সদস্যরা সংবিধানকে আরো সরলীকৃত করার প্রয়োজন অনুভব করেন। সেই সুবাদে ওয়েবেনের রাজ্য কমিটি মনোনীত একটি দল সংবিধানকে পর্যালোচনা করে সংবিধান সংশোধন করেন। এর আগে রাজ্য কার্য্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের মতামত গৃহিত হয় এবং মতামতগুলি নিয়ে চর্চা করা হয়। এরপর একটি খসড়া সংবিধান প্রস্তুত করে নতুন রাজ্য কমিটির সঙ্গে আলোচনা করা হয় এবং ওয়েবেনের সংবিধানকে সংশোধন করা হয়।

বিদ্যালয়ে শাস্তির প্রতিবাদে দাবীপত্র পেশ করল ওয়েবেন

সাম্প্রতিক কালে বিদ্যালয়ে শাস্তির ক্রমবর্ধমান ঘটনার শঙ্কিত হয়ে ওয়েবেনের সদস্যরা, ঘটনাগুলিতে সাধ্যমত পৌঁছে তথ্য সংগ্রহ করা এবং এর সঙ্গে সঙ্গে ওয়েবেনের জেলার সদস্য এবং সাধারণ মানুষের সই সম্বলিত দাবীপত্র পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের (NCPCR) সভানেত্রী এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেইমত জেলা নেটওয়ার্কগুলি এই ধরণের ঘটনার প্রতিবাদ করে এবং এই ধরণের ঘটনা রোধে যথাযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য জেলা কমিটির পক্ষ থেকে এবং স্থানীয় মানুষের সই সংগ্রহ করে পাঠানো হয়। এর সঙ্গে রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকেও জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের (NCPCR) সভানেত্রী কাছে দাবীপত্র পাঠানো হয়।

ওয়েবেনের অনুসন্ধান দলের কয়েকটি রিপোর্ট

ছাত্রের রহস্যজনক মৃত্যু : একটি অনুসন্ধান প্রতিবেদন

ঘটনাস্থল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের অন্তর্গত ঝড়খালি বাজারের হেড়োভাঙ্গা বিদ্যাসাগর বিদ্যামন্দির (উচ্চ মাধ্যমিক) বিদ্যালয়। ৩ জুলাই, ২০১২ ভোরে বিদ্যালয়ের ভেতরে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র সত্যজিৎ মন্ডলের (১৪ বছর বয়স) মৃতদেহ ঝুলতে দেখা যায়। প্রতিটি দৈনিক সংবাদপত্রের পাতায় এই খবর গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়। খবরে প্রকাশ হোস্টেলের এবং মিড-ডে মিলের খাবারের গুণমান নিয়ে প্রতিবাদ করার জন্য তাকে খুন করা হয়েছে বলে ছাত্রটির পরিবারের তরফে দাবি করা হয়েছে।

বিদ্যালয়ের মধ্যে ছাত্রের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনা ওয়েবেন-এর সদস্যদের যথেষ্ট উদ্বিগ্ন বোধ করে। তাঁরা মনে করেন, এই ঘটনার সত্য উন্মোচন হওয়া জরুরী। ভবিষ্যতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের শিশু অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে সে জন্য তারা ঘটনার কার্য্য-কারন অনুসন্ধান করে প্রশাসনের কাছে স্বারকলিপি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ওয়েবেনের পক্ষে চার সদস্যের এক প্রতিনিধি দল ৬ জুলাই, ২০১২ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকার মানুষজনের সাথে এবং শিশুটির পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলেন। এরপর তারা ক্যানিং মহকুমার মহকুমা শাসককে একটি স্বারকলিপি জমা দেন।

প্রতিনিধি দল যেসব জায়গায় গেছেন :

- মৃত ছাত্র সত্যজিৎ মন্ডলের বাড়ি, থুমকাটি গ্রাম, আমরাবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত, ক্যানিং থানা
- হেড়োভাঙ্গা বিদ্যাসাগর বিদ্যামন্দির (উ: মা:) বিদ্যালয়, ঝড়খালি বাজার, থানা এবং ব্লক - বাসন্তী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
- মহকুমা শাসকের কার্য্যালয়, ক্যানিং

অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত তথ্য :

মৃত ছাত্রের পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলে জানা যায়, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঘটনা সম্পর্কে কিছুই তাঁদের পরিবারকে জানাননি। তাঁরা একজন গ্রামবাসী, যিনি বিদ্যালয় এলাকায় নিজের ব্যক্তিগত কাজে গিয়েছিলেন তাঁর থেকে ছেলের মৃত্যু সংবাদ জানতে পারেন। মনোরঞ্জন মন্ডল, ছাত্রের বাবা দাবি করেন, তাঁর ছেলে হোস্টেলের এবং মিড-ডে মিলের খাবারের গুণমান নিয়ে প্রতিবাদ করায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে খুন করেছে। তিনি সি বি আই অনুসন্ধানের দাবি তোলেন। তিনি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁর ছেলের মৃত্যুর জন্য এফ আই আর (নং ৪৩৬/১২ তারিখ ৩ জুলাই, ২০১২) দায়ের করেছেন। তিনি বলেন, ২০১১ সালে সপ্তম শ্রেণিতে এই বিদ্যালয়ে ছেলেকে ভর্তি করেন। হোস্টেলে ভর্তির জন্য ৩০০০ টাকা জমা দেন।

শিশুটির মা কৃষ্ণা মন্ডল বলেন, ভবিষ্যতে আরো কোনো শিশুর সাথে যেন এরকম ঘটনা না ঘটে, সেজন্য এই হোস্টেল বন্ধ করে দেওয়া হোক।

ছাত্রের দুই দিদি রমা নস্কর এবং সোমা নস্কর বলেন, পারিপার্শ্বিক প্রমাণ থেকেই বোঝা যায় এটি খুনের ঘটনা। আত্মহত্যার ঘটনার ক্ষেত্রে সাধারণত: যা দেখা যায় এ ক্ষেত্রে সেরকম কিছু দেখা যায়নি। ছাত্রর কাকা ননী মন্ডল একই মত প্রকাশ করেন।

ঘটনার পর থেকে বিদ্যালয় বন্ধ রয়েছে। বিদ্যালয় গেটে তালা বন্ধ থাকায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে প্রতিনিধিদলের কোনো কথা বলার সুযোগ ঘটেনি। ঘটনার পর আবাসিকের সব ছাত্ররাই বাড়ি চলে গেছে। বিদ্যালয় সংলগ্ন গ্রামে বসবাসকারী এই বিদ্যালয়ের দুজন ছাত্র-ছাত্রীর সাথে কথা বলা সম্ভব হয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দ্বাদশ শ্রেণীর এক ছাত্র জানায়, হোস্টেল এবং মিড-ডে মিলের খাবারের গুণমান নিয়ে সমস্যা হওয়ায় ছাত্ররা প্রতিবাদ সংগঠিত করে এবং সত্যজিৎ মন্ডল এই প্রতিবাদে নেতৃত্ব দেয়। দশম শ্রেণীর এক ছাত্রীও হোস্টেল এবং মিড-ডে মিলের খাবারের গুণমান নিয়ে সমস্যা ও প্রতিবাদের কথা বলেন। তারা দুজনেই ৩০ জুন, ২০১২ এই প্রতিবাদ সংগঠিত হয়েছিল বলে জানায়। এই ঘটনার পর রাজনৈতিক রং লেগে যাওয়ায় কেউ নাম প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক। প্রতিনিধি দল কয়েকজন গ্রামবাসীর সাথে কথা বললেও তাঁরা এই ঘটনা নিয়ে মুখ খুলতে রাজি হয়নি। এলাকার পরিবেশ থমথমে এবং ঘটনাটি দলীয় রাজনৈতিক চেহারা নিয়েছে বলে গ্রামবাসীরা জানান।

বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সদস্য এবং পঞ্চায়েত প্রধান একই রাজনৈতিক দলের হওয়ায় বিষয়টি রাজনৈতিক রূপ নিয়েছে। প্রতিনিধি দল এলাকা পরিদর্শনের সময় দেখতে পান সেখানে র‍্যাফ নিয়োগ করা হয়েছে। ৪ জুলাই সেখানে একটি রাজনৈতিক দলের ডাকে বনধ্ পালন করা হয়। ৫ জুলাই একটি ছাত্র ইউনিয়নের ডাকে ছাত্র ধর্মঘট হয়।

প্রতিনিধি দলের মতামত : শিশুটির মৃত্যু সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট মতামত দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু মৃত্যু ঘিরে রহস্য আছে, সে কথা বলা যায়। বিদ্যালয়ের হস্টেলের এবং মিড-ডে মিলের খাবার নিয়ে সমস্যা রয়েছে একথাও অধিকাংশ মানুষই জানিয়েছেন। বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলতে না পারায় এটা জানা সম্ভব হয়নি যে, শিক্ষা অধিকার আইন অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে অভিযোগ জানানোর কোনো সুযোগ আছে কিনা। প্রতিনিধি দল মনে করে ছাত্রের এই রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনা শিশু অধিকার লঙ্ঘনের একটি উদাহরণ। দ্রুত এই ঘটনার তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

প্রতিনিধি দলের প্রস্তাব :-

- বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রশাসনিক উদ্যোগে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিদ্যালয় খুলতে হবে।
- ছাত্রের এই রহস্যজনক মৃত্যুর বিচার বিভাগীয় তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।
- ভয়হীন ও শিশুবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে প্রশাসন এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিশেষ নজর দেওয়া উচিত।
- হোস্টেলের এবং মিড-ডে মিলের খাবারের গুনমান বজায় রাখতে বিশেষ কমিটি গঠন।
- শিক্ষা অধিকার আইন অনুযায়ী বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি গঠন।
- রাইট টু এডুকেশনে প্রটেকশন অথোরিটি এবং জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের হস্তক্ষেপ।
- রাজ্যে অতি দ্রুত রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ গঠন।

বিদ্যালয়ে এই ধরণের শাস্তি কবে বন্ধ হবে ?

নিজস্ব সংবাদ - উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গাইঘাটা ব্লকের বেড়ি-গোপালপুর হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী সাহানা মন্ডল (নাম পরিবর্তিত)। গত ২৭শে জুন অন্যান্য দিনের মতোই স্কুলে গিয়েছিল সে। কিন্তু সেই দিনটা ছিল অন্যরকম। প্রথম পিরিয়ডে নাম ডাকার পর শ্রেণী শিক্ষিকার নজর পড়ে তার উপর। তিনি তাকে তাঁর কাছে আসতে বলেন ও তিরস্কার করেন। অপরাধ ? সে স্কুলের পোশাকের অন্তর্ভুক্ত সালোয়ারটি পড়ে এসেছে, কারণ তার একমাত্র অন্তর্বাসটি ভিজে ছিল। কিন্তু স্কুলের ভূগোল দিদিমণি সেকথায় কান দেননি। তার দাবি এই পোশাক শীতের সময়ে পড়ে আসার কথা, সে কেনো এখন পড়েছে। তাকে এক্ষুনি সালোয়ারটি খুলে ফেলতে হবে। সাহানার কাকুতি-মিনতিতে মন গলেনি শিক্ষিকার। তিনি জোর করে অন্য ছাত্রীদের সামনে তাকে সালোয়ারটি খুলতে বাধ্য করেন। মানসিক ভাবে লজ্জিত সাহানা কোনওমতে সেদিনটা ক্লাস করে বাড়ি এসেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয় প্রশাসন, মিডিয়া, এলাকার মানুষ সরব হন। সাহানার বাবা ইসলামুল মন্ডল (নাম পরিবর্তিত) থানায় FIR করেন শিক্ষিকার বিরুদ্ধে। শিক্ষিকা গেপ্তার হন, পরে ব্যক্তিগত জামিনে ছাড়া পান।

সেই ঘটনার প্রায় একমাস অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পর মানসিকভাবে কার্যত ভেঙে পড়া সাহানা স্কুলে যেতে পারেনি।

গত ৩১শে জুলাই ওয়েবেনের পক্ষে একটি দল যার মধ্যে ছিলেন জেলা নেটওয়ার্কের পাঁচজন সদস্য - মণিকা সরকার, দীলিপ পাল, সমীর বিশ্বাস, ফিরোজ আহমেদ ও শৈলেন্দ্রনাথ কাবাসী ও রাজ্য সঞ্চালক সাহানার বাড়িতে যান এবং তার সাথে ও তার পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলেন। ঘটনার এতদিন পরেও ছাত্রীটি ওইদিনের কথা উঠতেই তার কান্না থামাতে পারছেনা। তার দাবি ওই দিন তার সঙ্গে আরো চারজন সহপাঠিনীর একই দশা করেছিলেন ওই শিক্ষিকা। কিন্তু তাদের কথা কোথাও প্রকাশিত হয়নি। সে স্কুলে যেতে চায়, পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চায়। কিন্তু ওই শিক্ষিকার ক্লাস করা তার পক্ষে এখনো সম্ভব নয়। ওয়েবেনের সদস্যরা তার সাথে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন ও তার মানসিক জোর ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। তাঁরা তাকে বোঝান এইভাবে স্কুলে না গেলে আখেরে তারই ক্ষতি। এর সাথে সদস্যরা সাহানার অভিভাবকদের সাথেও কথা বলেন ও তাদের বোঝানের চেষ্টা করেন। বিদ্যালয়ে মানসিক ও শারিরীক শাস্তি যে এখন আইনত নিষিদ্ধ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ, এই ব্যাপারেও তাদের সাথে আলোচনা করা হয়। শেষে সাহানা ও তার পরিবার বিদ্যালয়ে যাওয়া শুরু করার জন্য অনেকাংশেই রাজি হয়। তবে সাহানার বাবার আশঙ্কা, দিদিমণিটি এলাকার প্রভাবশালী পরিবারের সদস্য, ফলে তার মেয়ের বড় কোনও ক্ষতি হতে পারে।

ওয়েবেনের সদস্যরা সিদ্ধান্ত নেন যে তারা ছাত্রীটি স্কুলে যেতে শুরু করলে তারা স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং প্রয়োজনে এই শিক্ষিকার সঙ্গে কথা বলবেন এবং এরপরে যদি সাহানার অন্য কোনও ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দেয়, তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহনে উদ্যোগী হবে।

সাহানা যদি আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারে এবং স্কুলে যাওয়া নিয়মিত শুরু করে, তাহলে হয়তো অন্য ছাত্র-ছাত্রী, যারা এই ধরণের শাস্তির ভুক্তভোগী তারা তাদের ভেঙে পড়া মানসিকতাকে আবার চাঙ্গা করে তুলতে পারবে এবং এই ধরণের ঘটনা যাতে আর না ঘটে তার জন্য ওয়েবেনের সমস্ত সদস্য তথা, প্রতিটি মানুষকে সচেষ্ট হতে হবে।

আমাদের সন্তানেরা এইভাবে কতদিন যন্ত্রণা ভোগ করবে? আমরা কি এদের পাশে দাঁড়াবো না?

বিদ্যালয়ে ছাত্রীর উপর প্রধান শিক্ষিকার অমানুষিক ব্যবহার

১২ই জুলাই ২০১২ বৃহস্পতিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সুতাহাটা ব্লকের দোর কৃষ্ণনগর বানী তীর্থ বালিকা বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীর উপর প্রধান শিক্ষিকার নির্মম প্রহারে রাজ্যবাসী উদ্বিগ্ন। ঘটনাটি অসুস্থ ছাত্রী নীলাঞ্জনা মাইতির সাথে এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে প্রকৃত তথ্য জানার চেষ্টা করে ওয়েবেনের জেলা সদস্যরা। শনিবার মেয়েটির বাড়িতে পৌঁছে দেখা যায় মেয়েটি বাড়িতে শুয়ে রয়েছে। বয়স ১৩-১৪ হবে। আমাদের ডাকাডাকিতে মেয়েটির মা কুমকুম মাইতি নীলাঞ্জনাকে সাথে নিয়ে ধরে ধরে বাড়ির বারান্দায় নিয়ে আসে। ''নীলাঞ্জনার সাথে কথা বলে, তাতে মেয়েটি যা ঘটনার বিবরন দিল তা শিউরে ওঠার মতই। নীলাঞ্জনার কথায় বৃহস্পতিবার দুপুরে বৃষ্টি কারনে বিদ্যালয়ের খোলা জানালা দিয়ে জল ঢুকে পড়ে শ্রেণী কক্ষের বেশ খানিকটা অংশ ভিজে যায়। এরপর আমরা টিফিনের সময় মিড-ডে-মিল খেয়ে ক্লাসে ঢুকি। আমার হাতে একটি জলের বোতল ছিল। এরপরেই প্রধান শিক্ষিকা সংস্কৃত ক্লাস নেওয়ার জন্য ক্লাসে ঢোকেন। প্রথা মাফিক আমরা বেঞ্চে বসে পড়ি। বৃষ্টির জল ক্লাস রুমে পড়ার পরে আমরা মিড-ডে মিল খেলে কক্ষে ঢুকলে জুতোর কাদায় শ্রেণী কক্ষের সামনের অংশ কাদা হয়ে যায়। প্রধান শিক্ষিকা সন্ধ্যা জানা শ্রেণী কক্ষে ঢোকা মাত্রই রেগে চিৎকার করে ওঠেন। বলেন কে এখানে জল ফেলে কাদা করেছে? (এখানে বলা ভাল দিদিমনি যখনই ক্লাসে ঢোকেন কোন সামান্য ভুল করলেই ছাত্রীদের তিনি হয় মারধর মরেন কিংবা অশ্রাব্য গালিগালাজ করেন।) ভয়ে আমার অন্যান্য বন্ধুরা সামনের বেঞ্চে বসা আমাদের দেখিয়ে দেয়। বলে আমরাই জল ফেলে কাদা করেছি। আর আমার হাতে থাকা জলের বোতল দিদিমনির চোখে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কোন কথা না শুনেই সকলের সামনেরই আমাকে এলোপাথাড়ী মারতে থাকেন। এরপর বলেন আমার জামা খুলে ক্লাস রুমের কাদা জল পরিস্কার করতে হবে। দিদিমনির এই কথায় আমি প্রতিবাদ করি এবং আপত্তি জানাই। এতে দিদিমনি আরো রেগে গিয়ে বলেন আমার কথার অবাধ্য হওয়া, দাঁড়া তোকে দেখাচ্ছি মজা। বলে চুল ধরে টানতে টানতে স্টাফ রুমে নিয়ে যান এবং আবার আমাতে নির্মমভাবে হাতে, পিঠে, শরীরের পেছনের অংশে প্রহার করেন। এরপর আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। বিদ্যালয়ের অন্যান্য দিদিমনিরা দাঁড়িয়ে দেখলেও প্রধান শিক্ষিকার ভয়ে প্রতিবাদ করতে সাহস দেখান নি। স্টাফ রুমে ছেড়ে দিয়ে তিনি চলে গেলে অন্যান্য দিদিমনিগণ আমাকে আর্নিকা খাওয়ান এবং মারের চোটে শরীরের বিভিন্ন ফুলে যাওয়া অংশে ভোলিনি স্প্রে লাগান। প্রায় ২ ঘন্টা পর আমি উঠে বসতে সমর্থ হই। প্রায় বিকেল ৫টা নাগাদ নবম শ্রেণীর বড় দিদিদের সাহায্যে বাড়ি ফিরে মাকে সব ঘটনার কথা বলি। আমার আক্ষেপ দিদিমনি আমায় কিছু জিজ্ঞেস না করেই আমাকে মারধর করলেন। আমি জল ফেলিনি।''

নীলাঞ্জনার মা কুমকুম মাইতি বলেন, ''এখন শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী শিশুদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন দেওয়া নিষিদ্ধ হয়েছে। তাছাড়াও বৃহস্পতিবার থেকে আজ পর্যন্ত কোন খোঁজ নেননি। সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশ পাওয়ার পরে তিনি আজ শনিবার সকালে এসেছিলেন। বাড়িতে বসেন নি শুধু বললেন কিছু মনে করবেন না রাগের কারনে একটু বেশী মারধর হয়েছে। কিন্তু মিডিয়ার কাছে তিনি এই ঘটনার সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বলেছেন জামা খুলে বলা হয়নি মারধরও করা হয়নি, কেবলমাত্র বকা হয়েছিল।''

''আমি এত কিছু ঘটনা সত্বেও থানায় অভিযোগ করিনি। কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের সম্পাদক তুষার মাইতির কাছে অভিযোগ করেছি। তিনি ৭ দিন সময় নিয়েছেন। তার পরে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করব। তবে মেয়েকে আমি স্কুলে পাঠাব। মেয়ে কিন্তু স্কুলে যেতে চাইছেনা। জামা না খোলায় জামা ধরে টানাটানি করেছেন দিদিমনি তা ব্যর্থ হওয়ায় আবার প্রহার করেছেন।''

এরপর প্রতিনিধি দল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার সাথে দেখা করে কথা বলতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন না, তিনি বাহিরে কোন কাজে গেছেন। সহ শিক্ষিকা মৃনালিনী মজুমদার বলেন, ''যদিও ঘটনার দিন আমি স্কুলে ছিলাম না তবে কিছু একটা ঘটেছে এটা ঠিক কিন্তু বিশেষ কিছু হয়নি বা ছাত্রীটিকে জামা খুলতে বলা হয়নি এটা বানানো গল্প।'' পাশে বসা বিদ্যালয়ের কেরানী তপনবাবু বলেন, ''আমরা আজকে (শনিবার) ঐ ছাত্রীটির বাড়ি গিয়েছিলাম ও সম্পূর্ণ সুস্থ। আমরা যখন ওর বাড়িতে যাই তখন ও টিউশান পড়তে গেছে। ঘটনার পরের দিন ও যথারীতি স্কুলে এসেছিল, এমন কিছু ঘটেনি।''

ঐ এলাকায় একটি মাত্র বালিকা বিদ্যালয় থাকার কারনে অনেক দূরবর্তী স্থান থেকে ছাত্রীরা এখানে পড়তে আসে। এই ঘটনায় ছাত্রীদের এবং অভিভাবকদের মনে ভীতির সঞ্চার হয়েছে। এলাকার গ্রামে পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা না থাকায় গ্রামের অধিকাংশ অভিভাবক সহ গ্রামের মহিলারা বিদ্যালয় চত্বরেই আসেন জল সংগ্রহ করতে। তাদের মধ্যে মর্জিনা বিবির কথায় ''প্রধান শিক্ষিকা সারা বছর নিজের মতই চলেন কারুর কোন কথা শোনেন না। নিজে যা ভাল মনে করেন তাই করেন। ছাত্রী-অভিভাবকদের সাথে সর্বদা দূর্ব্যবহার করেন। ছাত্রীরা মিড-ডে মিল খাওয়ার সময় যদি দ্বিতীয়বার ভাত চেয়ে ফেলে তবে 'কাঙালী' বলে অপমান করেন। শুধু তাই নয় কখনো ভদ্রব্যবহার করেন না। এমনকি তার সহ কর্মীদের সাথেও তাঁর তীব্র বচসা হয়। আমরা জল নিতে এলে শুনতে পাই।''

আমরা (ওয়েবেন) মনে করি এই বিদ্যালয়ে প্রতিনিয়ত শিশু অধিকার খর্ব করা হচ্ছে। এই অভাবনীয় ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের অনুরোধ জানাচ্ছি।

জেলা আহ্বায়ক, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা, ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক

প্রাথমিক শিক্ষা ও কেন্দ্র-রাজ্যের সদিচ্ছা

তপন কুমার দাস
প্রধান শিক্ষক, কাপাসহাঁড়িয়া অক্ষয় প্রাথমিক বিদ্যালয়, হুগলী

জাতীর জনক মহাত্মা গান্ধীজীর কথা যদি বলি তাহলে শিক্ষা বলতে সাধারণত অক্ষর জ্ঞান বোঝায়। আর শিশুদের লিখতে পড়তে ও অঙ্ক কষতে শেখানোর নাম হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। ভারতের শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাব সুদূর বৈদিক যুগ থেকে বর্তমান কালের শিক্ষা নানারূপ বৈচিত্র্যপূর্ণভাবে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটেছে। বৈদিক ও তৎপরবর্তী হিন্দু সমাজ যে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বিশেষ অবহিত ছিল তা তৎকালীন প্রাচীন মুনিঋষিদের অভিমত থেকে আমরা কিছুটা উপলব্ধি করতে পারি। আর্য ঋষিরা মনে করতেন 'আত্মজ্ঞান ও আত্মপোলব্ধিই শিক্ষার চরম লক্ষ্য। বিদ্যাই দেয় মানুষের মুক্তির সন্ধান - 'মা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে'। পূর্বজ্ঞান, শক্তি ও আনন্দ জীবাত্মায় নিহিত। যা পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দের কথায় সেই সুরেরই ঝংকার দেখা গেছে - "Education in the manifestation of the perfection already in man". তাঁর কথায় পূর্ণতা লাভই শিক্ষার চরম লক্ষ্য।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি ইংরেজ সরকারের উদাসীনতা বা বিমাতৃসুলভ আচরণ আমরা জেনে এসেছি। মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখেলের প্রচেষ্টায় জনসাধারণ ও সরকারের ১৯১৮ খ্রী: প্রাথমিক শিক্ষার আইন বিধিবদ্ধ হয়। দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের জন্য ভারতীয় শিক্ষামন্ত্রীরা বিশেষ তৎপর হয়ে ওঠেন। তারপর ১৯২০ খ্রী: থেকে ১৯৩০ খ্রী: মধ্যে ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই প্রাথমিক শিক্ষার আইন পাশ হয়। বাংলায় ঐ আইন পাশ হয় ১৯১৯ খ্রী:। আবার ঐ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রাথমিক শিক্ষার ত্রুটি দূর করার জন্য এবং শিক্ষকের অবস্থার উন্নতির জন্য এবং ১৯৩০ খ্রী: পল্লী অঞ্চলের জন্য গ্রামীন প্রাথমিক শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হয়। ঐ সময় প্রাথমিক শিক্ষকদের অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ছিল খুবই অপ্রীতিকর। বাংলাদেশে তাঁরা যে বেতন পেতেন তা দিয়ে দুবেলা দুমুঠো অন্ন সংস্থান করা ছিল খুবই ভয়াবহ।

এতদিন জেলা বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও পরিচালনার দায়িত্ব ছিল। নতুন আইনে 'জেলা স্কুল বোর্ড' গঠন করে সেই স্কুল বোর্ডের উপর শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব দেওয়া হল।

কিন্তু কয়েকবছর পরেই এই আইনের বেশ কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করা গেল। পূর্বে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম ছিল মোট পাঁচ বছরের, নতুন আইনে তা কমিয়ে চার বছর করা হল। স্কুল বোর্ডগুলিতে স্থানীয় রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িক বিষ ঢুকে নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। কোনও সম্প্রদায় থেকে উপযুক্ত শিক্ষক না পাওয়া গেলেও সম্প্রদায় ভিত্তিতে অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করে শিক্ষা প্রসারের ব্যাঘাত ঘটানো হয়।

১৯৩০ খ্রী: প্রাথমিক শিক্ষার আইনের একটা বড় কথা ছিল ১০ বছরের মধ্যে সারা বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে। কিন্তু সরকারী নিষ্ক্রিয়তার ফলে প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার উল্লেখযোগ্য ছিল না।

১৯৩৫ খ্রী: বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী আজিজুল হক আইনসভায় শিক্ষা পুনর্গঠনের এক প্রস্তার পেশ করেন। কিন্তু ঐ সুপারিশ জনসাধারণের বিরোধিতায় কাজে পরিণত করা যায়নি।

এর পরেই আসে বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা। মহাত্মা গান্ধী নতুন শিক্ষাদর্শ বা পরিকল্পনা সুফল সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে বলেন - বৃত্তিশিক্ষার অভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায় কোন কিছুই উৎপাদনে অক্ষম আর এতে শারীরিক দিক থেকে তাদের ক্ষতি হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে অর্থব্যয় হচ্ছে তা একপ্রকার অপব্যয়। তাঁর পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষা শিল্পকেন্দ্রিক। শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা - শিক্ষা হবে স্বনির্ভর। বুনিয়াদী শিক্ষার মূল কথা - কাজের মধ্য দিয়ে জ্ঞান আহরণ।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে সমীক্ষার ফল

খ্রীষ্টাব্দ	প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা	শিক্ষার্থী
১৮৮১-৮২	৮২,৯১৬	২০,৬১,৫৪১
১৯০১-০২	৯৩,৬০৪	৩০,৭৬,৬৭১
১৯২১-২২	১,৫৫,০১৭	৬১,০৯,৬৭৯
১৯৩৬-৩৭	১,৯২,২৪৪	১,০২,২৪,২৮৮
১৯৪৫-৪৬	১,৬৭,৭০০	১,৩০,২৭,৩১৩
১৯৪৬-৪৭	১,৩৪,৮৬৬	১,০৫,২৫,৯৪৩

দেশ ভাগ হওয়ার ফলে ১৯৩৬-৩৭ খ্রী: পরিসংখ্যানের সঙ্গে ১৯৪৬-৪৭ খ্রী: প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার কতটা হয়েছিল তা পরিস্কার চিত্র পাওয়া দুস্কর।

স্বাধীন ভারতের সংবিধান গঠিত হওয়ার পর স্কুল শিক্ষা প্রসারের বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টা করা হয়। প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন হয় যাতে বলা হয় শিশুর দৈহিক, মানসিক ও ভাবগত বিকাশে এই স্তর একটা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। ৩-৫ বছরের শিশুরা এই স্তরে শিক্ষালাভ করবে। প্রতিটি জেলায়, এই শিক্ষা পরিচালনা, পরিদর্শন ও প্রসারের জন্য একটি করে কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। সংবিধানে আরও নির্দেশিত হয়েছে ১৪ বছর পর্যন্ত প্রতিটি শিক্ষার্থীর বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা রাষ্ট্র করবে। প্রাথমিক শিক্ষার মান এমনভাবে উন্নত করতে হবে প্রতিটি ছাত্র যেন এই শিক্ষায় দায়িত্বশীল নাগরিক হয়ে ওঠে।

১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে দ্রুত বাধ্যতামূলক করবার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ শহরাঞ্চলের জন্য একটি আইন পাশ করান। ঐ আইনে স্থির হয়, ৬-১১ বছর বয়সের প্রতিটি ছেলেমেয়ের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক হবে। ১৯৬৪-৬৫ খ্রী: পশ্চিমবাংলায় প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল ৩৪,৪১৩টি, শিক্ষকের সংখ্যা ৯৮,৩০৬ জন এবং ছাত্রসংখ্যা ৩৬,৫০,০০০ জন। গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হলেও বাধ্যতামূলক না হওয়ায় শিশুদের মধ্যে অনেকেই বিদ্যালয়মুখী হয়না। ১৯৭৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা আইন নামে একটি আইন পাশ হয়। আইনের প্রধান উদ্দেশ্য সারা পশ্চিমবাংলায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। নতুন আইনে পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নের দায়িত্ব প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। ঐ পর্ষদের নিয়ন্ত্রনে জেলায় জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

১৯৭৭ খ্রী: বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক কিছু পরিবর্তন ঘটানো হয়। পরবর্তীতে চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার শেষে বৃত্তিপরীক্ষা, পাশফেল প্রথা তুলে দেওয়া হয়। ১৯৮১ খ্রী: থেকে প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি পড়ানোও বন্ধ করা হয়। পরবর্তীকালে ড: অশোক মিত্র কমিশন ও পবিত্র সরকার কমিশনের সুপারিশ মেনে ইংরাজী ফিরিয়ে আনা হয়। বর্তমানে এই ইংরাজী ভাষা শেখানোর জন্য ইংরাজীর মাধ্যমেই শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হয়।

যে কোনও সামাজিক প্রগতিতেই প্রাথমিক শিক্ষা একটি প্রধান সোপান বলে গণ্য হয়। ১৯৭৬-৭৭ সালে শিক্ষার জন্য পরিকল্পনা বহির্ভূত খরচ যেখানে ১২.৯ শতাংশ ছিল ১৯৯২-৯৩ সালে তা বেড়ে হয়েছিল ২১.১ শতাংশ। নতুন বিদ্যালয় স্থাপন, শিক্ষা নিয়োগ, বিনামূল্যে পুস্তক প্রদান প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বেশ কিছু ইতিবাচক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই পরিবর্তন কতটুকু ফলপ্রসূ হয়েছে তা অবশ্যই তর্কের বিষয়। পরিসংখ্যান ও বাস্তবের মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই থাকে। তবে একটা কথা অবশ্যই বলার অপেক্ষা রাখেনা। স্বাধীনতার পরেও এ রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা হেলাফেলারই শিকার। **ক্রমশ..**

সুস্মিতা চন্দ কর্তৃক সম্পাদিত এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর রাজ্য কমিটির পক্ষে স্বপন গুপ্ত কর্তৃক ৬০এ/২ ব্যানার্জী পাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৭০০০৩১ হইতে প্রকাশিত।
দূরভাষ-০৩৩-২৪০৫ ৫৩৩৪, ই-মেল:wbenwb@gmail.com, ওয়েবসাইট: wben.info মুদ্রণে: শ্রী প্রেস, কলকাতা-৭০০ ০৭৮, দূরভাষ: ২৪০৫ ১৮৭৮ *অনুদান: ৩ টাকা*
কেবলমাত্র সভ্য ও সমর্থকদের মধ্যে বিতরণের জন্য

গ্রামীন ভারতে স্কুলে শিশুদের নথিভুক্তি বাড়লেও উপস্থিতির হার কমেছে

■ রবি রায় ■

২০১০-এর তুলনায় ২০১১-তে স্কুলে শিশুদের (৬-১৪) নথিভুক্তি যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে অনুপস্থিতিও. এই তথ্য জানা গেছে সম্প্রতি (১৬ জানুয়ারি ২০১২) কেন্দ্রের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক দ্বারা প্রকাশিত গ্রামীণ ভারতের Annual Status of Education Report 2011 (ASER 2011) থেকে। এই রিপোর্ট অনুসারে, শিশুদের বে-সরকারি স্কুলমুখী হওয়াও অব্যাহত। রিপোর্টে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল, প্রাইভেট টিউশনের উপর নির্ভরতা বেড়েছে। এছাড়া এই রিপোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, রিডিং পড়া ও অঙ্কে শিশুদের দক্ষতা কমেছে। এই রিপোর্টটিকেই দেশের সর্ববৃহৎ শিক্ষা-সমীক্ষা হিসাবে দাবি করা হয়ে থাকে।

রিপোর্ট (ASER 2011) অনুসারে, ২০১১ সালে ভারতের গ্রামাঞ্চলে ৬-১৪ বছর বয়সী শিশুর স্কুলে নথিভুক্তির হার ৯৬.৭%। অর্থাৎ নথিভুক্ত (বা ভর্তি) না হওয়া শিশু ৩.৩%, বিগত বছরে এই হার ছিল ৩.৫%, ২০০৯-এ ছিল ৪.০% এবং ২০০৫-এ ছিল ৬.৬%। পশ্চিমবঙ্গে স্কুলের বাইরে থাকা শিশুর হার (২০১১) জাতীয় গড়ের তুলনায় বেশি, ৪.৩% (সারণি-১ দ্রষ্টব্য)। পশ্চিমবঙ্গ বাদে দেশের বাকী ২৭টি রাজ্যে স্কুলের বাইরে থাকা পড়ুয়ার সংখ্যা শতাংশের হিসাবে নিম্নরূপ:

অন্ধ্রপ্রদেশ	২.৮	মহারাষ্ট্র	১.১
অরুণাচল প্রদেশ	৩.৮	মনিপুর	১.১
আসাম	৪.২	মেঘালয়	৫.৮
বিহার	৩.০	মিজোরাম	০.৬
ছত্তিশগড়	২,৪	নাগাল্যান্ড	২.০
দমন ও দিউ	০.০	ওড়িশা	৩.৭
গুজরাট	২.৭	পন্ডিচেরী	০.০
হরিয়ানা	১.৪	পঞ্জাব	১.৬
হিমাচল প্রদেশ	০.৬	রাজস্থান	৪.৫
জম্মু ও কাশ্মীর	২.৫	তামিলনাড়ু	০.৯
ঝাড়খন্ড	৪.৭	ত্রিপুরা	১.৩
কর্ণাটক	২.৮	উত্তরপ্রদেশ	৬.১
কেরেলা	০.১	উত্তরাখন্ড	১.১
মধ্যপ্রদেশ	২.২		

উপরোক্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে, দু'টি রাজ্যে - দমন ও দিউ এবং পন্ডিচেরী - কোনো শিশু (৬-১৪) স্কুলের বাইরে নেই, ১৮টি রাজ্যের অবস্থান জাতীয় গড়ের নীচে এবং পশ্চিমবঙ্গ সহ ৮টি রাজ্যের অবস্থান জাতীয় গড়ের উপরে।

বালিকাদের নথিভুক্তির হারও ২০১০-এর (৮৯.৭%) তুলনায় ২০১১-তে (৯৪.৮%) বেড়েছে। ২০১১-তে এই হার বিহারে ৯৫.৫% এবং পশ্চিমবঙ্গ ও ছত্তিশগড়ে ৯৫.৭% করে। ২০০৬ পর্যন্ত এইসব রাজ্যে এই হার ৯০ শতাংশের আশেপাশে থাকত। তবে ২০০৬-এর তুলনায় ভারতের সর্ববৃহৎ রাজ্য উত্তরপ্রদেশে এই হার কমতির দিকে ছিল ৯০.৩% (২০০৬), হয়েছে ৮৮.৯% (২০১১)।

রিপোর্ট অনুসারে, পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের নথিভুক্তির জাতীয় গড় ৫৭.৮% (২০১১)। ২০০৯-এর (৫৪.৬%) তুলনায় এই হার বাড়লেও ২০১০-এর (৬২.৮%) তুলনায় কমেছে।

সামগ্রিকভাবে নথিভুক্তি বেড়েছে সত্য, তবে রিপোর্টে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, শিশুরা ক্রমেই বে-সরকারি স্কুলমুখী হচ্ছে। ২০১১-তে বে-সরকারি স্কুলে নথিভুক্তির জাতীয় হার ২৫.৬%, ২০০৬-এ এই হার ছিল ১৮.৭%, ২০০৯-এ ২১.৮% এবং ২০১০-এ ২৪.৩%।

সারণি-১

বিভিন্ন ধরনের স্কুল নথিভুক্ত ও স্কুলের বাইরে থাকা শিশু (%)

% of Children in different types of schools 2011

বয়স (Age group)		সরকারি	বে-সরকারি	অন্যান্য*	স্কুলের বাইরে**	মোট
ভারত						
৬-১৪	সবাই	৬৯.৯	২৫.৬	১.১	৩.৩	১০০
৭-১৬	সবাই	৬৮.০	২৫.৭	১.০	৫.৩	১০০
৭-১০	সবাই	৭১.৫	২৫.৩	১.৩	১.৯	১০০
৭-১০	বালক	৬৯.৩	২৭.৮	১.২	১.৮	১০০
৭-১০	বালিকা	৭৪.১	২২.৫	১.৪	২.১	১০০
১১-১৪	সবাই	৬৮.৭	২৫.৬	০.৯	৪.৮	১০০
১১-১৪	বালক	৬৬.৮	২৮.০	০.৯	৪.৪	১০০
১১-১৪	বালিকা	৭০.৮	২৩.১	০.৯	৫.২	১০০
১৫-১৬	সবাই	৫৭.০	২৭.০	০.৮	১৫.৩	১০০
১৫-১৬	বালক	৫৬.৮	২৭.৯	০.৭	১৪.৬	১০০
১৫-১৬	বালিকা	৫৭.২	২৫.৯	০.৮	১৬.১	১০০
পশ্চিমবঙ্গ						
৬-১৪	সবাই	৮৭.৮	৬.৩	১.৬	৪.৩	১০০
৭-১৬	সবাই	৮৬.৮	৫.০	১.৬	৬.৬	১০০
৭-১০	সবাই	৮৭.৩	৯.০	১.৫	২.২	১০০
৭-১০	বালক	৮৬.৩	৯.৮	১.৬	২.৪	১০০
৭-১০	বালিকা	৮৮.৩	৮.৩	১.৪	২.০	১০০
১১-১৪	সবাই	৮৯.৬	২.৪	১.৭	৬.৩	১০০
১১-১৪	বালক	৮৭.৩	২.৪	১.৯	৮.৪	১০০
১১-১৪	বালিকা	৯১.৯	২.৪	১.৫	৪.৩	১০০
১৫-১৫	সবাই	৭৯.৪	২.০	১.৬	১৭.০	১০০
১৫-১৬	বালক	৭৬.৫	২.০	১.৮	১৯.৭	১০০
১৫-১৬	বালিকা	৮২.৬	২.০	১.৩	১৪.২	১০০

* 'অন্যান্য' বলতে মাদ্রাসা ও EGS-এর পড়ুয়াদের বোঝানো হয়েছে।

** স্কুলের বাইরে = স্কুলছুট + যাদের নাম কখনও নথিভুক্ত হয়নি।

বে-সরকারি স্কুলে ভর্তির প্রবণতা কয়েকটি রাজ্যের ক্ষেত্রে যে বেশ উদ্ধমূখী তথ্যই তা বলে দিচ্ছে। দেশের ৫৫৮টি জেলার ১৬ হাজার গ্রামের ৭ লক্ষ শিশুকে নিয়ে করা সমীক্ষায় দেখা গেছে প্রতি ৪ জন গ্রামীণ শিশুর মধ্যে ১ জন বে-সরকারি স্কুলে পড়তে যায়। কেরালা ও মনিপুরে হার ৬০ শতাংশেরও বেশি। হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, পাঞ্জাব, উত্তরাখন্ড, মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রপ্রদেশে হার ৩০ থেকে ৫০ শতাংশের মধ্যে রয়েছে। উত্তরপ্রদেশে বর্তমানে (২০১১) এই হার ৪৫%, ২০০৫-এ ছিল ২২%। তামিলনাড়ুতে ২০০৫-এর ১৬% থেকে এই হার বর্তমানে (২০১১) বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫%।

নথিভুক্ত বাড়লেও, বিগত সময়ের তুলনায় শিশুদের উপস্থিতি বেশ কমেছে - ২০০৭-এ ছিল ৭৩.৪%, ২০১১-তে কমে হয়েছে ৭০.৯%। উচ্চ-প্রাথমিকের ক্ষেত্রে কমতির প্রবণতা বেশি দেখা গেছে - ৭৫.৬% (২০০৭) থেকে কমে হয়েছে ৭১.৯% (২০১১)।

রিপোর্ট অনুসারে, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশে ২০০৭-এর তুলনায় ২০১১-তে উপস্থিতির হারের ক্ষেত্রে কমতির প্রবণতা যথেষ্ট বেশি - বিহারে ৫৯% থেকে হয়েছে ৫০%, মধ্যপ্রদেশে ৬৭% থেকে হয়েছে ৫৪.৫% ও উত্তরপ্রদেশে ৬৪.৪% থেকে হয়েছে ৫৭.৩%।

তবে রিপোর্টে শিক্ষকদের উপস্থিতির হার বেশ ভাল দেখা গেছে, ৮৭%। গুজরাটে এই হার সর্বাধিক, ৯৫.৬%।

রিপোর্টে প্রাইভেট টিউশনের উপর নির্ভরতার তথ্য স্পষ্ট। সরকারি ও বে-সরকারি উভয় স্কুলের ক্ষেত্রেই ২০% থেকে ২৫% পড়ুয়া প্রাইভেট টিউশন নিয়ে থাকে বলে রিপোর্টে জানানো হয়েছে। প্রাথমিকে প্রতি ৫ জনের মধ্যে ১ জন প্রাইভেট টিউশন নিয়ে থাকে। প্রাইভেট টিউশন নেওয়ার ক্ষেত্রে যেসব রাজ্যের হার খুব বেশি তাদের অন্যতম পশ্চিমবঙ্গ।

সারণি-২

প্রাইভেট টিউশন (%

Class-wise % of children attending PAID TUTION CLASSES by school tupe 2007, 2009, 20010 and 2011

বছর	স্কুল	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ	৭ম	৮ম
ভারত									
২০০৭	সরকারি	১২.০	১৫.৭	১৯.১	২১.৩	২৩.৩	২৩.৫	২৪.৩	২৬.১
	বেসরকারি	১৯.৫	২৩.০	২৫.০	২৫.৯	২৬.২	২৪.১	২৫.০	২৪.৮
২০০৯	সরকারি	১৭.১	২০.৩	২২.৩	২৩.৪	২৫.৪	২৭.৬	২৮.১	৩০.৭
	বেসরকারি	২৩.৩	২৬.৫	২৮.৬	২৯.৮	২৮.২	২৬.১	২৬.৪	২৭.৪
২০১০	সরকারি	১৫.০	১৮.২	২০.৭	২২.২	২৫.২	২৬.০	২৬.৬	২৯.০
	বেসরকারি	১৮.১	২০.৯	২৩.৪	২৫.৩	২৩.৭	২৪.০	২৩.৯	২২.৪
২০১১	সরকারি	১৫.৮	১৯.৫	২১.২	২৪.০	২৫.৪	২৫.৮	২৭.৭	২৮.৪
	বেসরকারি	১৮.৯	২১.১	২৩.২	২৩.৩	২৩.১	২১.৬	২২.২	২২.৪
পশ্চিমবঙ্গ									
২০০৭	সরকারি	৩০.৬	৪৫.৬	৬৩.০	৭৪.০	৮৩.৩	৮৪.৯	৮৩.৭	৮৮.৫
	বেসরকারি	৪০.৫	৫৪.৯	৫৯.৫	৬৭.০	৬২.৭	৬৮.৬	৭৫.৬	৮৯.৭
২০০৯	সরকারি	৫১.৫	৬৩.৯	৬৮.৭	৭৪.২	৭৫.৬	৮০.৮	৮৫.৭	৮৬.৬
	বেসরকারি	৬৩.৯	৭১.৪	৭৪.৪	৮৩.৬	৮৭.৭	৭৯.২	৭৮.৯	৭১.২
২০১০	সরকারি	৫০.৬	৬৩.৯	৬৯.৮	৬৮.৬	৭৫.৬	৭৬.১	৮০.১	৮৩.১
	বেসরকারি	৬০.৭	৭৩.১	৬৫.০	৬৫.১	৬৫.৪	৬১.৩	৭৫.৪	৭২.৯
২০১১	সরকারি	৫৬.৬	৬৫.৩	৬৭.৪	৭২.৭	৭৬.৯	৭৭.৫	৮২.৪	৮১.৭
	বেসরকারি	৫৪.০	৬৯.৯	৬৯.৯	৭৯.৪	৪৫.৮	৫২.৪	৬০.৬	৬৫.৪

সারণীতে উল্লেখিত নির্দিষ্ট ৪টি বছরে প্রাইভেট টিউশন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই চার বছরেই একটি প্রশ্ন করা হয়েছে, ‘‘শিশুটি কি সম্প্রতি মাহিনা দিয়ে কোনো বাড়তি ক্লাস করেছে?’’ সুতরাং সারণীতে উল্লেখিত সংখ্যাগুলির মধ্যে বাবা-মা-দাদা-দিদি বা অন্য কারো কাছে পড়াশুনায় সাহায্য নেওয়ার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত নয়, কারণ তার জন্য কোনো মাহিনা দেওয়া হয়নি।

সরকারি ও বে-সরকারি পরিচালনাধীন স্কুল নির্বিশেষে এমনকী প্রথম শ্রেণিতেও শিশুরা টিউশন নিয়ে থাকে। ২০০৭, ২০০৯, ১০১০ ও ২০১১ - এই চার বছরে প্রাইভেট টিউশন সম্পর্কে ASER রিপোর্টের জন্য যে তথ্য সংগ্রহ করা হয় তাতে দেখা গেছে, জাতীয় পর্যায়ে সরকারি স্কুলে প্রথম শ্রেণিতে ২০০৭-এ প্রাইভেট টিউশন নেওয়া শিশুর হার ছিল ১২%, যা ২০১১-তে বেড়ে হয় ১৫.৬%। পশ্চিমবঙ্গে এই হার যথাক্রমে ৩০.৬% ও ৫৬.৬%, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের হার জাতীয় হারের অনেক উপরে রয়েছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, একটিকে সময় যত এগিয়েছে প্রাইভেট টিউশন নেওয়ার প্রবণতাও বেড়েছে, আবার অন্যদিকে প্রথম থেকে অষ্টম - এই আটটি শ্রেণিতে তলা থেকে যত উপরের দিকে উঠেছে ততই শিশুদের প্রাইভেট টিউশন নেওয়ার হার বেড়েছে। সরকারি স্কুলকে পাল্লা দিয়ে বে-সরকারি স্কুলেও প্রাইভেট টিউশন ক্রমবর্ধমান। (সারণী-২ দ্রষ্টব্য)

রিপোর্ট থেকে আরও জানা গেছে, রিডিং পড়া ও অঙ্কে শিশুদের দক্ষতা কমেছে। পাঞ্জাব, গুজরাট ও তামিলনাড়ু বাদে ভারতের আর সব রাজ্যেই পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়াদের দ্বিতীয় শ্রেণির কোন বই থেকে পড়ার ক্ষেত্রে ক্ষমতা ২০১০-এর (৫৩.৭%) থেকে ২০১১-তে (৪৮.২%) কমেছে।

সারণি-৩

শ্রেণিগতভাবে শিশুদের রিডিং পড়ার ক্ষমতা (%)

% of children by Class and READING Level
All Schools 2011

শ্রেণি	একেবারেই পারে না	অক্ষর-জ্ঞান আছে	শব্দ-জ্ঞান আছে	পড়তে পারে ১ম শ্রেণির পাঠ্য	পড়তে পারে ২য় শ্রেণির পাঠ্য	মোট
ভারত						
১ম	৩৮.৪	৩৯.৪	১৫.৩	৩.৯	৩.০	১০০
২য়	১৬.৬	৩৪.৬	২৮.৩	১১.৮	৮.৭	১০০
৩য়	৮.৫	২২.৯	২৮.৪	২১.৫	১৮.৮	১০০
৪র্থ	৪.৭	১৪.৪	২১.২	২৫.৭	৩৪.২	১০০
৫ম	৩.৫	৯.৭	১৪.৬	২৪.১	৪৮.২	১০০
৬ষ্ঠ	১.৭	৫.৮	৯.৩	২০.৫	৬২.৮	১০০
৭ম	১.২	৪.০	৬.৩	১৬.২	৭২.৪	১০০
৮ম	১.০	২.৬	৪.৩	১২.৭	৭৯.৪	১০০
পশ্চিমবঙ্গ						
১ম	২০.২	৪৫.৩	২১.৮	৮.১	৪.৬	১০০
২য়	৯.৭	৩৩.৬	৯.৫	১৪.৮	১২.৪	১০০
৩য়	৫.২	১৯.৯	২৬.৯	২৩.৯	২৪.১	১০০
৪র্থ	৩.৪	১৩.৯	২২.২	২৬.৬	৩৩.৯	১০০
৫ম	২.৪	৮.৪	১৫.৩	২৫.২	৪৮.৮	১০০
৬ষ্ঠ	১.৯	৫.৩	৯.৪	২৫.৫	৫৭.৯	১০০
৭ম	০.৯	৩.৩	৫.৫	১৭.১	৭৩.২	১০০
৮ম	০.৪	১.১	৩.৪	১৪.৮	৮০.৩	১০০

Each cell shows the highest level of reading achieved by a child.

সমীক্ষায় আমাদের রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা দেশেই ১ম থেকে ৮ম শ্রেণিতেই অক্ষর-জ্ঞানহীন পড়ুয়ার সন্ধান মিলেছে। জাতীয় পর্যায়ে ১ম শ্রেণির ৩৮.৪% শিশুর কোনো অক্ষর জ্ঞান নেই,৩৯.৪% অক্ষর জ্ঞান আছে, তবে ঐ পর্যন্তই, ১৫.৩% শব্দ পড়তে পারে কিন্তু ১ম শ্রেণির পাঠ্যবই পড়তে পারে না, মাত্র ৩.৯% শিশু ১ম শ্রেণির পাঠ্যবই পড়তে পারে। আলোচ্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় গড়ের উর্দ্ধে থাকলেও দেখা গেছে

সারণি-৪

শ্রেণিগতভাবে শিশুদের পাটিগণিতে ক্ষমতা (%)

% of children by Class and ARITHMETIC Level
All Schools 2011

শ্রেণি	একেবারেই পারে না	সংখ্যা-জ্ঞান আছে ১-৯	সংখ্যা-জ্ঞান আছে ১১-৯৯	বিয়োগ পারে	ভাগ পারে	মোট
ভারত						
১ম	৩৬.৫	৪২.২	১৬.৯	৩.২	১.২	১০০
২য়	১৫.০	৩৮.৫	৩২.৮	১১.০	২.৭	১০০
৩য়	৭.৫	২৬.৯	৩৫.৭	২৩.২	৬.৭	১০০
৪ম	৩.৮	১৭.২	৩০.৬	৩২.৩	১৬.১	১০০
৫ম	২.৯	১২.০	২৪.১	৩৩.৫	২৭.৬	১০০
৬ষ্ঠ	১.৬	৭.৪	১৮.৮	৩২.৮	৩৯.৪	১০০
৭ম	১.৩	৫.০	১৫.৪	৩০.০	৪৮.৩	১০০
৮ম	১.১	৩.৪	১২.৫	২৬.৩	৫৬.৮	১০০
পশ্চিমবঙ্গ						
১ম	১৫.৯	৪৮.২	২৭.৭	৫.৭	২.৬	১০০
২য়	৭.০	৩৫.৩	৩৫.৩	১৬.৪	৬.০	১০০
৩য়	৪.১	২২.০	৩৩.২	২৭.০	১৩.৭	১০০
৪র্থ	২.৩	১৬.৬	২৪.৭	৩৬.৪	২০.২	১০০
৫ম	১.৫	১০.২	২৪.৮	৩২.১	৩১.৪	১০০
৬ষ্ঠ	১.৭	৬.৩	২০.৯	৩২.১	৩৯.০	১০০
৭ম	০.৫	৩.৯	১৫.৭	২৬.০	৫৩.৮	১০০
৮ম	০.৪	১.০	১৩.৪	২৫.৯	৫৯.২	১০০

Each cell shows the highest level of arithmetic achieved by a child.

১ম শ্রেণির মাত্র ৮.১% শিশু ১ম শ্রেণির পাঠ্যবই পড়তে পারে। প্রাথমিক শেষ ধাপ ৫ম শ্রেণিতেও অক্ষর-জ্ঞানহীন পড়ুয়া পাওয়া গেছে - জাতীয় পর্যায়ে ৩.৫% ও পশ্চিমবঙ্গে ২.৪%, আর ১ম শ্রেণিতে পাঠ্যবই বড়তে সক্ষম শিশু জাতীয় পর্যায়ে ৪৮.২% ও পশ্চিমবঙ্গে ৪৮.৮%। অক্ষর-জ্ঞানহীন পড়ুয়ার সন্ধান পাওয়া গেছে এমনকী ৮ম শ্রেণিতেও - জাতীয় পর্যায়ে ও পশ্চিমবঙ্গে। (সারণী-৩ দ্রষ্টব্য)

পাটিগণিতের ক্ষেত্রে অবস্থা আরও খারাপ। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, সারা দেশে দু'সংখ্যার বিয়োগ করতে পারে এমন তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়ার সংখ্যা ২০১০-এর (৩৬.৩%) থেকে ২০১১-তে (২৯.৯%) কমেছে।

সমীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা দেশেই ১ম থেকে ৮ম সব শ্রেণিতেই সংখ্যা-জ্ঞানহীন পড়ুয়ার সন্ধান মিলেছে। জাতীয় পর্যায়ে ১ম শ্রেণির ৩৬.৫% শিশুর সংখ্যা সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই, ৪২.২% শিশু সর্বাধিক ৯ পর্যন্ত গুণতে পারে, ৯৯ পর্যন্ত গুণতে পারে ১৬.৯% শিশু কিন্তু বিয়োগ করতে পারেনা, ৩.২% শিশু সহজ বিয়োগ পারলেও ভাগ করতে পারেনা, আর সহজ ভাগ করতে পারে ১.২% শিশু। আলোচ্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় গড়ের উর্দ্ধে থাকলেও দেখা গেছে বিয়োগ ও ভাগ করতে পারে যথাক্রমে ৫.৭% ও ২.৬% শিশু। প্রাথমিকের শেষ ধাপ ৫ম শ্রেণিতেও সংখ্যা-জ্ঞানহীন পড়ুয়া পাওয়া গেছে - জাতীয় পর্যায়ে ২.৯% ও পশ্চিমবঙ্গে ১.৫%, আর বিয়োগ ও ভাগ করতে সক্ষম শিশু জাতীয় পর্যায়ে যথাক্রমে ৩৩.৫% ও ২৭.৬% শিশু এবং পশ্চিমবঙ্গে যথাক্রমে ৩২.১% ও ৩১.৪% শিশু। সংখ্যা-জ্ঞানহীন পড়ুয়ার সন্ধান পাওয়া গেছে এমনকী ৮ম শ্রেণিতেও - জাতীয় পর্যায়ে ও পশ্চিমবঙ্গে। (সারণী-৪ দ্রষ্টব্য)

চলতি শিক্ষা অধিকার আইন অনুসারে যেসব শর্ত পূরণ প্রয়োজন তা থেকেও বেশ দূরে অবস্থান করছে স্কুলগুলি - ASER 2011 তা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে।

রবি রায় কর্তৃক সম্পাদিত এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর রাজ্য কমিটির পক্ষে স্বপন পণ্ডা কর্তৃক ৬০এ/২ ব্যানার্জী পাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৭০০০৩১ হইতে প্রকাশিত। দূরভাষ-০৩৩-২৪০৫ ৫৩৩৪, ই-মেল:wbenwb@gmail.com, ওয়েবসাইট: wben.info মুদ্রণে: প্রী প্রেস, কলকাতা-৭০০ ০৭৮, দূরভাষ: ২৪০৫ ১৮৭৮ ***অনুদান: ৩ টাকা***

কেবলমাত্র সভ্য ও সমর্থকদের মধ্যে বিতরণের জন্য